গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৪ - ১০ মার্চ, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

আরব ভূখণ্ডে গণআন্দোলনের ঝড়

গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী মেহনতি মানুষ গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আরব দুনিয়ার চলমান আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে আছেন। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে এতবড় আন্দোলন বিশ্বের কোথাও দেখা যায়নি। কোনও বিশেষ দলের নেতৃত্বে নয়; সাধারণ মানুষ জীবনের নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে দিনের পর দিন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। নির্মম দমন পীড়ন মোকাবিলা করে নিরস্ত্র মানুষ লড়ছে। এই আন্দোলন শুধু আরব ভূখণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরতন্ত্রী বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠীকেই নয়, বিশ্বের ঝানু সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে একটি ছোট্ট দেশ টিউনিশিয়ায় এই সংগ্রামের শুরু। সেই সংগ্রামের আগুন মিশরকে প্রজ্জ্বলিত করল। টিউনিশিয়া এবং মিশরের সংগ্রামের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আলজিরিয়া, লিবিয়া, সুদান, জর্ডন, সিরিয়া, ইয়েমেন, বাহরিন প্রভৃতি দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। কেন দাবানলের মতো এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল? কী সমস্যা এইসব দেশগুলির সাধারণ মানুষের? সমস্যা মূলত একই ধরনের। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির মতোই আরব ভূখণ্ডের এই সমস্ত দেশে বেকার সমস্যা তীব্র, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে, মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন এই সংকটকে তীব্রতর করেছে। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাম্প্রতিক মহামন্দা এবং দুনিয়াজোড়া তার প্রভাবে এই সমস্ত দেশেও সংকট আরও বেড়েছে। জনজীবন বিপর্যস্ত। মানুষ কী করে খেয়েপরে বাঁচবে তার কোনও সংস্থান নেই। গোটা জীবনটাই অনিশ্চিত।

২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও'র সংহতি মিছিল

মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী এবং অল্পসংখ্যক উচ্চবিত্তের হাতে প্রায় সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ সম্পদহীন রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বহারা। আয়ের বৈষম্য বিরাট। দুর্নীতিতে এবং বিলাসব্যসনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শাসকদলের নেতা মন্ত্রীরা। এই দুঃসহ অবস্থায় প্রতিকার চাইবার কোনও উপায় নেই। দেশের ভেতরে কোনও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। সভা সমিতি মিছিল মিটিং করার সুযোগ নেই। সর্বত্র সেনামদতপুষ্ট একদলীয় বুর্জোয়া স্বৈরশাসনে এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি। ফলে গোটা আরব দুনিয়া বিক্ষোভের বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। লাভা নিঃসৃত না হলে আগ্নেয়গিরির ভেতরে যে এত আগুন আছে তা যেমন বাইরের শান্তরূপ দেখে বোঝা যায় না, তেমনি অবস্থা আরব দুনিয়ার।

টিউনিশিয়ার মানুষ ফেটে পড়ল এক সব্জি বিক্রেতার উপর পুলিশি আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই বিক্ষোভ চালিত হল স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন চলল। দুই শতাধিক মানুষ শহিদের মৃত্যুবরণ করল, হাজার হাজার মানুষ আহত হল। শেষ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত স্বৈরশাসক রাষ্ট্রপতি বেন আলিকে দেশ ছেড়ে পালাতে হল। মিশরেও টানা ১৮ দিন ধরে চলল আন্দোলন। ছাত্র-যুবক-নারী-পুরুষ-শ্রমিক-কৃষক, শিশু থেকে বৃদ্ধ — সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নামে। তিন শতাধিক মানুষ শহিদের মৃত্যুবরণ করে। শেষ পর্যন্ত এখানেও রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এখন আন্দোলন চলছে লিবিয়ায়। ১৯৬৯ সাল থেকে চলা স্বৈরশাসক মুয়াম্মার গদ্দাফির একনায়কত্বের বিরুদ্ধে রাজধানী ত্রিপোলি, বেনগাজি, তোবরুক প্রভৃতি শহরে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। টিউনিশিয়ার পর মিশরে আন্দোলনের সাফল্যে আতঙ্কিত হয়ে এ দেশের শাসকচক্র শুরু থেকেই আন্দোলনের উপর আক্রমণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই দুই হাজারেরও বেশি আন্দোলনকারী মারা গেছে। কিন্তু জনতার ঢল নেমেছে রাস্তায়। একে একে বিভিন্ন শহর চলে যাচ্ছে জনতার দখলে। আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে।

ইয়েমেনেও ১৯৭৮ সাল থেকে ক্ষমতাসীন আলি আবদুল্লাহ সালে সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছে। বাহরিনে ১৮২০ সাল থেকে চলা আল খলিফা পরিবারের দুঃশাসনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথায়

সিপিএম নেতারা বেজায় চটেছেন

২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এক সমাবেশে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের সরকারে এলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছেন সিপিএম নেতৃত্ব। সিপিএম ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন, "পশ্চিমবাংলায় আবার রাজনৈতিক বন্দী কোথায়? যাঁরা ছিলেন, তাঁদের তো আমরা ক্ষমতায় এসেই মুক্তি দিয়ে দিয়েছি।"

সিপিএমের মুখপত্র লিখেছে, "এ রাজ্যে বিনা বিচারে একজনও আটকে নেই। তৃণমূলের জোটসঙ্গী এস ইউ সি দলের যে প্রাক্তন বিধায়ক জেলে আছেন, তিনিও খুনের মামলায় আদালতে বিচারের পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জেলে আছেন। মাওবাদী সংগঠনের নেতা ছত্রধর মাহাতো কি রাজনৈতিক বন্দী? জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডে ধৃত মাওবাদী ও তৃণমূল কর্মী মনোজ মাহাতো রাজনৈতিক বন্দী? তা হলে তো বারাসতে রিঙ্কুর ভাই রাজীব দাসের হত্যায় ধৃত খুনি দুষ্কৃতী চন্দন রায়কেও রাজনৈতিক বন্দী বলতে হয়" (গণশক্তি ঃ ২২.২.২০১১)।

সিপিএম নেতাদের মতে, কেউ আদালতের রায়ে দণ্ডিত হলে তিনি আর রাজনৈতিক বন্দী নন। সিপিএম নেতারা ৩৫ বছর ক্ষমতায় থেকে ভুলে গিয়েছেন, কংগ্রেস আমলে গণআন্দোলনের যে হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও প্রতিবাদী মানুষকে বন্দী করা হয়েছিল, কংগ্রেস সরকার তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, এমনকী রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগও এনেছিল। বিচারে অনেকের শাস্তিও হয়েছিল। সেদিন এঁদের কি বিমানবাবুরা রাজনৈতিক বন্দী বলেননি? তা হলে রাজনৈতিক বন্দী কাদের বলা হবে, তা কে ঠিক করবে? তা কি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা কোনও শাসক দলের নেতা ঠিক করবে? রাজনৈতিক বন্দী বলতে কী বোঝায়, সিপিএম নেতারা এ প্রশ্ন তুললেও তার কোনও সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দেননি। কারণ, সে কথা বলতে গেলেই এ সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের চালাকিটা ধরা পড়ে যাবে।

চিরকালই শাসকশ্রেণীর শোষণ-অত্যাচার-প্রবঞ্চনা-চালাকির বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করেন, জনগণকে সংগঠিত করে লড়াই-আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁরা সকলেই শাসকশ্রেণীর চোখে অপরাধী। শাসকশ্রেণীর স্বার্থে তৈরি আইন দিয়েই তাঁদের বিচার করা হয়। ফলে, সেই আইনে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলেই, ন্যায়ের চোখে তিনি দোষী হয়ে যান না। আবার শাসকশ্রেণীর চোখে যিনি দোষী, শোষিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের চোখে তিনিই মুক্তি আন্দোলনের নেতা বা প্রতিনিধি। আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে ব্রিটিশ শাসকদের আইন-আদালতের বিচারে

তিনের পাতায় দেখুন

কেরালা ঃ সিপিএম সরকারের মদের ঢালাও প্রসারের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ

অ্যান্টি লিকার পিপলস স্ট্রাগল কমিটির নেতৃত্বে ১৭ ফেব্রুয়ারি ত্রিবান্দ্রমের সেক্রেটারিয়েটের সামনে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশের একাংশ। উপস্থিত থাকতে না পারায় বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ারের ভিডিও বক্তৃতার মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়।

প্রতারণাপূর্ণ জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট

২০১১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ আজ এক বিবৃতিতে বলেছেন,

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারি, প্রকৃত আয়ের ধারাবাহিক অবনমন, কৃষি ও কৃষকের সংকট, দুর্নীতি-কালো টাকা-মজুতদারি-কালোবাজারি ইত্যাদির দাপটে সাধারণ মানুষের জীবন যখন চূড়ান্ত বিপর্যস্ত, তখন তাদের জীবনে ন্যূনতম কোনও স্বস্তির ব্যবস্থা না করে অর্থমন্ত্রী জি ডি পি বৃদ্ধির পরিসংখ্যান শুনিয়েছেন, যার সাথে সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। পরিসংখ্যানের খেলায় তিনি সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থাকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। পুরানো ধারায় রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি বেচে,

দুয়ের পাতায় দেখুন

আন্দোলন করে সিকিউরিটির ২০০০ টাকা ফেরত পেলেন দিনহাটার কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকরা

কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার ওকরাবাড়ি, গিতালদহ, চৌধুরীর হাট, নাজির হাট প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ৮০০ চাষি বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার নেতৃত্বে আন্দোলন করে সিকিউরিটি হিসাবে জমা দেওয়া ২০০০ টাকা ফেরত পেলেন। এই টাকা কর্তৃপক্ষ গায়েব করে দেওয়ার ফন্দি করেছিল।

অ্যাবেকার আন্দোলনের ফলেই এইসব অঞ্চলের বোরো চাষের মরশুমে ১০৫ দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে হলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হয়। এজন্য সিকিউরিটি হিসাবে নেওয়া হয় ২০০০ টাকা করে। প্রথম বছর মিটার ছাড়াই একটা থোক টাকার বিনিময়ে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। কিন্তু এতে ক্ষুদ্র চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অ্যাবেকা মিটার দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে এবং তা আদায়ও হয়।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রায় ৮০০ চাষিকে মিটার দিতে পারেনি। এই চাষিরা বারবার মিটার দেওয়ার দাবি জানিয়েও তা পায়নি। ফলে মিটার না থাকার সুযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষ বিদ্যুতের বিল হিসাবে সিকিউরিটির ২০০০ টাকা ফেরত না দেওয়ার ফন্দি করে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে অ্যাবেকা। দিনহাটার গ্রুপ সাপ্লাই অফিস, কোচবিহারের ডিভিশনাল অফিস, জলপাইগুড়ির সার্কেল অফিস সর্বত্র ডেপুটেশন এবং বিক্ষোভ দেখানো হয়। ৬ মাস ধরে আন্দোলন চলে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ টাকা ফেরত দিতে টালবাহানা চালিয়েই যায়।

এমতাবস্থায় অ্যাবেকা নেতৃত্ব সার্কেল গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল অফিসারের (সি জি আর ও) নিকট অভিযোগ দায়ের করে এবং ওমবুডজ্‌মেন্টে বিচারের জন্য যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আন্দোলন এই স্তরে উঠলে ক্ষতিপূরণ সহ টাকা ফেরত দিতে হবে বুঝতে পেরে অবশেষে কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি সিকিউরিটির ২০০০ টাকা ফেরত দেয়। আন্দোলনের এই জয়ে অ্যাবেকার কোচবিহার জেলা সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী সংগ্রামী চাষিদের অভিনন্দন জানান। এই আন্দোলনে সংগঠনের দিনহাটা শাখার অন্যতম নেতা মানিক বর্মন সহ ভুক্তভোগী চাষি তাপস সরকার, অশ্বিনী রায় সরকার, আনসার আলি, ফজলে মিঞা, শচীন্দ্র রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

মরশুমের শুরুতেই চাষিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে আলু কেনার দাবি

গত বছর আলুর দাম না পেয়ে ব্যাপক ক্ষতির ঘা শুকোতে না শুকোতেই এ বছর চাষিরা আবার সংকটে পড়েছেন। গত বছর কিলো প্রতি উৎপাদন ব্যয় ছিল প্রায় ৫ টাকা। এ বছর এই খরচ বাড়বে। গত বছর চাষিরা বড় ব্যবসায়ীদের কাছে সরকারি সহায়ক মূল্য সাড়ে তিন টাকারও কমে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এই অভাবী বিক্রি ঠেকানোর জন্য ফসল ওঠার মুহূর্তেই সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হয়। কিন্তু এখনও সরকারের কোনও হেলদোল নেই। সরকার বেশি দামে বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আলু কিনেছিল। আবার যতটুকু আলু কেনা হয়েছিল, সেটাও হিমঘরে পচিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অথচ এ বছর ঠিক সময়ে হিমঘর থেকে বার করে বাজারে বিক্রি করলে, সাধারণ মানুষ কম দামে আলু কিনতে পারত, সরকারি অর্থের অপচয় হত না।

উপরোক্ত সমস্যা অবিলম্বে সমাধানের দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মহাকরণে কৃষিমন্ত্রী নরেন দে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে ৭ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। সহায়ক মূল্য শীঘ্র ঘোষণা করা হবে এবং দুর্নীতির তদন্ত হবে বলে কৃষিমন্ত্রী আশ্বাস দেন।

বিজয়গড় কলেজে এস এফ আই আই-এর মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানাল ডি এস ও

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে দীর্ঘদিন ধরে গায়ের জোরে নির্বাচন করতে না দিয়ে অগণতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে এস এফ আই। বিরোধী ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র নেতৃত্বে ছাত্ররা সংগঠিত হচ্ছে দেখে ডি এস ও কর্মীদের নামে তারা মিথ্যা প্রচার করছে। এস এফ আই বলছে, ১৮ ফেব্রুয়ারি নাকি ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদককে মিথ্যা অজুহাতে যাদবপুর স্টেশনে ডেকে নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে ডি এস ও-কর্মীরা। পরে এই ঘটনাকে অজুহাত করে এস এফ আই কলেজের পরিবেশ উত্তপ্ত করে তোলে এবং যাদবপুর থানায় সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। অথচ তার কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি এবং কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি। তাছাড়া যে ফোন নম্বর থেকে জি এস কে ফোন করে স্টেশনে ডাকা হয় বলে তারা দাবি করছে সে ফোন নম্বরের উল্লেখও তারা করেনি। এস এফ আই-এর এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড ইমতিয়াজ আলম বলেন, 'রাজ্য জুড়ে ছাত্রদের কাছে ধিক্কৃত এস এফ আই ছাত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রশাসনিক সহযোগিতায় বিরোধী কণ্ঠ রোধ করার এই অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট কৌশল নিয়েছে।

প্রতারণাপূর্ণ জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট

একের পাতার পর

বিদেশ থেকে আরও হট মানি আসার রাস্তা খুলে দিয়ে, কর্পোরেট পুঁজিপতিদের ট্যাক্স আরও কমিয়ে ও সাধারণ মানুষের দেয় অপ্রত্যক্ষ কর বাড়িয়ে তিনি ডুবন্ত অর্থনীতিকে ভাসাতে চেয়েছেন। এবারও যথারীতি অনুৎপাদক সামরিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিল্পসংকটের আবর্তে নিমজ্জিত ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পপ্রসারের নামে আবার পুরানো কায়দায় আবাসন শিল্পে মদত দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা ইত্যাদি কোনও ক্ষেত্রেই এই বাজেটে ন্যূনতম কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। আমরা এই বাজেটকে চূড়ান্ত জনবিরোধী ও প্রতারণাপূর্ণ বলে অভিহিত করছি এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

একটি পথিকৃৎ প্রকাশনা

Great Artist And His Art

Charlie and His Films

Krishna Chakraborty

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দঃ ২৪ পরগণা জেলার নলগড়া অঞ্চলের শরৎপল্লী গ্রামের কমরেড মানিক মিস্ত্রী গত ১৮ জানুয়ারি দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় এতদঞ্চলে দলের কাজকর্মের শুরু থেকে এলাকার জোতদার ও মহাজন গোষ্ঠীর রক্তচক্ষু ও আক্রমণকে উপেক্ষা করে কমরেড মানিক মিস্ত্রী দলের সংস্পর্শে আসেন এবং কাজকর্ম শুরু করেন।

তিনি তিনবার দলের প্রার্থী হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন এবং দলের শিক্ষা অনুযায়ী পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সচেষ্ট থাকতেন। জয়নালের খেয়াঘাটে জমি দান করে বিহারী মিস্ত্রীকে দিয়ে জনসাধারণকে বিনা পয়সায় পারাপারের ব্যবস্থা করেন ও জয়নালের খেয়া সংলগ্ন মণি নদীর উভয় পারে বাজার তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন সহ বহু জনহিতকর কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর মরদেহে নলগড়া ১ ও ২নং লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

কমরেড মানিক মিস্ত্রী লাল সেলাম

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আলোচনা সভা

৬ ফেব্রুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি-র আহ্বানে মেদিনীপুর শহরে মোহনানন্দ বিদ্যামন্দিরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভুম, হাওড়া ও কলকাতার রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও সংগঠকরা। তাঁরা বিভিন্ন জেলায় কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা ও সমস্যার দিকগুলি তুলে ধরেন।

সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিমল জানা। কমরেড জানা বলেন, স্বাধীনতার এত বছর বাদেও সরকারি কর্মচারীদের জন্য কোনও অ্যাক্ট নেই। কংগ্রেস, বিজেপি বা সিপিএম সমর্থননির্ভর পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট — কোনও সরকারই তা করার উদ্যোগ নেয়নি। কর্মচারী স্বার্থবিরোধী প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে হবে। মূল বক্তা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, নিম্নবিত্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, রুশ বিপ্লবের পর শ্রমিক বিপ্লবের ভয় থেকেই শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য বুর্জোয়া দেশগুলির মতো আমাদের দেশের শাসকশ্রেণী শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক বেতন, ফেয়ার ওয়েজ, লিভিং ওয়েজ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট সহ কিছু কল্যাণমূলক আইন তৈরি করেছে। যদিও আজ আর সেগুলি কার্যকরী হচ্ছে না। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তা ও শিক্ষাকে হাতিয়ার করে অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই সংগ্রামে আমরা বিপ্লবী চিন্তা নিয়ে চলি বলেই ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন আদর্শের মানুষকে নিয়েও চলতে পারি। মার্কসবাদী চিন্তার মানুষ না হওয়া সত্ত্বেও নেতাজীর অনুগামী কমরেড সুধীন প্রামাণিক আমাদের সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন।

আজ রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে কিছু চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। তা করতে হলে আমাদের সকলকেই উন্নত চিন্তার আধারে পাল্টাতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কিছু নেতৃত্ব সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করে চলেছে। এদের মধ্যে থেকে বামপন্থায় আস্থাশীল অংশটিকে আমাদের সংগ্রামী বামপন্থার দ্বারা আকৃষ্ট করতে হবে।

বেকারদের চাকরির দাবিতে ত্রিপুরায় যুব অবস্থান

১৭ ফেব্রুয়ারি অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে পুরাতন আর এম এস চৌমুহনীতে বিকাল ৩টা থেকে অবস্থান করা হয়। তাঁদের দাবিগুলি ছিল (১) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে, (২) সকল বেকারের চাকরি অথবা বেকার ভাতা দিতে হবে, (৩) কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে, (৪) চাকরি নিয়ে স্বজনপোষণ ও দলবাজি বন্ধ করতে হবে, (৫) 'রেগা'র মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে, (৬) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, (৭) মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে, (৮) প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, (৯) যৌনতা ও অশ্লীলতার প্রচার বন্ধ করতে হবে, (১০) মহিলাদের উপর নির্যাতনকারী এবং অত্যাচারী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড বাবুল বণিক এবং সভাপতি কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী।

ভুল সংশোধন

৬৩ বর্ষ ২৮ সংখ্যা গণদাবীতে প্রকাশিত ভাঙড় থানা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলনের সংবাদে বক্তাদের নাম হিসাবে ভুলক্রমে লেখা হয়েছে 'পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জলিল ঢালি'। পরিবর্তে হবে, 'পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গৌরহরি মণ্ডল ও অ্যাবেকার ভাঙড় গ্রুপ সাপ্লাই-এর সম্পাদক জলিল ঢালি।' এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত — সম্পাদক, গণদাবী।

পশ্চিমবঙ্গে নাকি রাজনৈতিক বন্দী নেই !

একের পাতার পর

যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, জেলে গিয়েছেন, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরাই দেশের মানুষের কাছে শহিদের মর্যাদা পেয়েছেন, সত্যিকারের মানুষ হিসাবে আজও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, প্রীতিলতা, ভগৎ সিং, আসফাকুল্লাদের ব্রিটিশ শাসকরা সন্ত্রাসবাদী ও খুনি বললেও কোনও যথার্থ দেশপ্রেমিক ভারতীয় তা মনে করেন না। ১৯৫০-৬০-এর দশকে এ রাজ্যে উত্তাল বামপন্থী আন্দোলনের সময়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী শাসক কংগ্রেস নানা ক্রিমিনাল চার্জ দিয়ে নির্বিচারে গ্রেফতার করেছিল বামপন্থী দলগুলির নেতা-কর্মীদের, এমনকী অনেকের সাজাও হয়ে গিয়েছিল। সিপিএম নেতারা বলেছেন, ঐ সব রাজনৈতিক বন্দীদের তাঁরা সরকারে এসে মুক্তি দিয়েছেন। কংগ্রেস শাসকরা কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকৃতি দেয়নি।

শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী কোনও শাসক দল যখন নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ থেকে বা রাজনৈতিক বিদ্বেষ থেকে, বা রাজনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী বা গণআন্দোলনের কর্মীদের পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখে বা বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে কারাদণ্ড দেয়, তখনই তাঁদের রাজনৈতিক বন্দী বলে। তা হলে, শাসকদল নয়, গণআন্দোলনের শক্তি বা মঞ্চই স্থির করে কারা রাজনৈতিক বন্দী, আর কারা নয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা উঠতেই গণশক্তির হঠাৎ কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, ন'বারের জয়ী বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইতের নাম মনে এল কেন? আসলে সিপিএম নেতারাও জানেন, রাজনৈতিক বিদ্বেষ, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য থেকেই মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়। যে ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই ঘটনার পরপরই এ রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা কুলতলির সেই বিশেষ গ্রামে গিয়ে তদন্ত করে স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন, হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এ কথা ঠিক, কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে প্রবোধবাবুর কোনও যোগই নেই, সে সময় তিনি সে স্থানে ছিলেনও না। তারপরও সাক্ষী-সাবুদের ভিত্তিতে নিম্ন আদালতের রায়েও প্রবোধবাবুরা নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছিলেন। সিপিএম যথারীতি হাইকোর্টে আপীল করে এবং অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সেই আপীলের শুনানি হয়ে রায় ঘোষিত হয়ে যায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের। এই-ই তো প্রবোধবাবুদের কারাদণ্ডের ইতিহাস! সিপিএম অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করালেও সাধারণ মানুষকে তারা বিশ্বাস করাতে পারেনি যে, সুদীর্ঘকাল চাষি আন্দোলনের এই বিশিষ্ট নেতা মানুষ খুন করেছেন। আজও কুলতলি তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শোষিত মানুষের বুকে তিনি গণআন্দোলনের নেতা হিসাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে শাসক সিপিএমের আপত্তি থাকলেও রাজ্যের সাধারণ মানুষ, শোষিত শ্রমিক-কৃষকের চোখে তিনি রাজনৈতিক বন্দীই। কুলতলি বিধানসভাই রাজ্যে একমাত্র বিধানসভা যেখানে বারবার সিপিএম প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই কুলতলি এবং জয়নগর এলাকা থেকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সংগঠন মুছে ফেলতে ১৫৮ জন নেতা-কর্মীকে খুন করিয়েছে সিপিএম। প্রবোধবাবু ছাড়াও সিপিএম আরও ৪৮ জনকে মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করিয়েছে। আরও এক হাজারেরও বেশি কর্মীর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা সহ নানা মিথ্যা মামলা ঝুলছে। বর্ধমানে দলের রাজ্য কমিটির একজন সদস্য সহ তিনজনকে যে খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা এই খুনের সঙ্গে আদৌ জড়িত নন। এলাকায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সংগঠন ভাঙার উদ্দেশ্যেই সিপিএম এঁদের এই খুনের সঙ্গে জড়িয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, এই বন্দীদের একজন উত্থান পাল বন্দী অবস্থাতেই পরীক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সিপিএম নেতারা আজ শুধু বামপন্থাকে ত্যাগ করেছেন তাই নয়, নৈতিকভাবেও এতখানি অধঃপতিত হয়েছেন যে, অনায়াসে গণআন্দোলনের এই সব নেতৃত্বের সাথে রাজীব দাসের হত্যায় ধৃত খুনি চন্দন রায়ের তুলনা করতেও তাঁদের বাধেনি। অবশ্য তাঁদের দলে আজ চন্দন রায়, তপন-সুকুর, দুলাল, ক্যালসা মিঞারাই তো সম্পদ। ফলে, এমন কথা সিপিএম নেতাদের মুখে আজ আর অস্বাভাবিক নয়।

১৯৭৭ সাল থেকে গণআন্দোলন দমনে সিপিএম যে ভূমিকা পালন করেছে, তাতে কংগ্রেসের সাথে তাদের কোনও ফারাকই প্রায় নেই। সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর যে সব জনবিরোধী ও চূড়ান্ত অবামপন্থী নীতি নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-ই একমাত্র দল যে একের পর এক লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ১৯৭৯ সালের ১৯ জুন মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন দিয়ে যার শুরু, পরবর্তীকালে পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালুর দাবিতে আন্দোলন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের চার্জবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি প্রত্যেকটি আন্দোলনে শাসক সিপিএম ব্যাপক পুলিশি অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, নির্বিচারে গ্রেপ্তার করেছে, মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে জেলে ভরেছে। কংগ্রেস আমলে গণআন্দোলনের কর্মীদের অনেক হয়রানি করা হয়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু সিপিএম আমলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীদের নামে যে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, তাতে জামিন পেলেও এবং এই সমস্ত কর্মীদের সম্পূর্ণ নির্দোষ জেনেও বিচারের নামে পুলিশকে দিয়ে তাঁদের যেভাবে ১০ বছর, ১৫ বছর ধরে কোর্টে ঘোরানো হচ্ছে, তা কংগ্রেস আমলেও হয়নি। পুলিশের এই আচরণের সঙ্গে কংগ্রেস শাসনের কোনও পার্থক্য সিপিএম নেতারা দেখাতে পারবেন কি? শাসকসুলভ কায়দায় গণআন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগগুলিকে তাঁরা যতই আইনি বৈধতা দিতে চান না কেন, রাজ্যের মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না। পারলে, আজ বন্দীমুক্তির কথা শুনে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন না।

পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোকে সিপিএম নেতারা মাওবাদী সংগঠনের নেতা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের এই মিথ্যাচার থেকেই প্রমাণিত যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা তাঁদের সমস্ত অভিযোগই বানানো। তাঁরা তাঁকে রাজনৈতিক বন্দী বলে মানতে রাজি নন। ছত্রধর যদি মাওবাদী সংগঠনের নেতা হন তবে ২০০৯ সালের ১৩ জুন জেলাশাসক, এস পি সহ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা তাঁর সাথে বৈঠকে বসেছিলেন কী করে? কই, সেদিন তো প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর সম্পর্কে মাওবাদী অভিযোগ তোলা হয়নি, এমনকী মাওবাদীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে এমন কথাও কেউ বলেননি। আসলে জনগণের কমিটির আন্দোলনের ফলে জঙ্গলমহলে সিপিএম নেতারা রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা ক্রমাগত পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছিলেন, জঙ্গলমহলের দীর্ঘ শোষণে জর্জরিত বিক্ষুব্ধ মানুষকে জবাব দেওয়ার মতো তাঁদের কিছু ছিল না। এমতাবস্থায় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সাথে যোগসাজশে যৌথবাহিনী মোতায়েনই জঙ্গলমহলে তাঁদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে বলে তাঁরা মনে করলেন এবং পরিকল্পিতভাবে মাওবাদী ধুয়ো তুললেন। সিপিএম নেতাদের পরিকল্পনা যে নিখুঁত ছিল তা আজ পরিষ্কার। কিন্তু মাওবাদী ধুয়ো এবং যৌথবাহিনীকে সামনে রেখে জঙ্গলমহল দখলের সিপিএমের পরিকল্পনা খানিকটা সফল হলেও তার দ্বারা জনগণের কমিটির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা রাজনৈতিক বন্দী হবেন না কেন? মেদিনীপুর জেলে যে ৭১ জনকে কুখ্যাত আইন ইউ এ পি এ-তে আটকে রাখা হয়েছে, তাঁরা রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাবেন না কেন?

কোচবিহার জেলে গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ৫১ জন বন্দী রয়েছেন। তাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে কারও মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের আন্দোলন তো রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকেই। তা হলে তাঁরা রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে বিবেচিত হবেন না কেন? প্রেসিডেন্সি জেলে ৩৪ জন বন্দী রয়েছেন যাঁরা রাজনৈতিক কারণে ধৃত। তাঁদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হবে না কেন? দমদম সেন্ট্রাল জেলে ৮ জন মাওবাদী এবং ১৯ জন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মী রয়েছেন। তাঁদের কাউকেই সিপিএমের 'গণতান্ত্রিক' সরকার রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেয়নি।

শাসক সিপিএমের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক চরিত্র এবং চরম স্বৈরাচারী চেহারা বেআব্রু করে দিয়েছে নন্দীগ্রাম আন্দোলন। সালিম সহ দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতে সেখানে গণআন্দোলনকে তারা নির্মমভাবে দমন করতে চেয়েছিল। তার জন্য একদিকে যেমন গণহত্যা, গণধর্ষণ চালিয়েছে, তেমনই গণআন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, নন্দীগ্রামে তাঁদের জমি নিতে যাওয়া ভুল হয়েছিল। তা হলে, নন্দীগ্রাম গণআন্দোলনের বন্দীরা রাজনৈতিক বন্দী হবেন না কেন? সিঙ্গুরের জমিরক্ষার আন্দোলনেও তারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে। সেখানেও আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে মিথ্যা মামলা করেছে। লালগড়ে তো পুলিশ যথেচ্ছভাবে নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে, এমনকী কালা কানুন ইউ এ পি এ-তে অভিযুক্ত করছে। স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশরা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এমনই অসংখ্য কালাকানুন জারি করেছিল। কংগ্রেস আমলেও গণআন্দোলন দমনের জন্য, রাজনৈতিক বিরোধিতা দমনের জন্য মিসা, নাসা, এসমা প্রভৃতি অসংখ্য কালা কানুন জারি ছিল। সিপিএমও আজ শাসক বুর্জোয়াদের স্বার্থে জারি করা কালা কানুনগুলিকে গণআন্দোলন দমনে ব্যবহার করছে। শাসক হিসাবে কংগ্রেস সিপিএমে ফারাক করা যাচ্ছে কি?

আসলে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা শুনে সিপিএম নেতারা ভয় পেয়েছেন। কারণ, পশ্চিমবঙ্গকে তাঁদের শাসনে 'গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য', 'নাগরিক অধিকারের মডেল' ইত্যাদি যে সব মিথ্যা প্রচারে তাঁরা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়েছেন, তার মুখোশ খুলে দেয় রাজ্যের জেলগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের তালিকা।

এক সম্ভাবনাময় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর অকাল মৃত্যু

এ আই ইউ টি ইউ সি সহ আটটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে পার্লামেন্ট অভিযানে অংশ নিয়ে ফেরার পথে এক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় সম্ভাবনাময় কর্মী পিরুল গড়াই-এর। তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২২ বছর। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (ডিভিসি)কন্ট্রাকটর্স এমপলয়িজ ইউনিয়নের অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড পিরুল গড়াই থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে কনট্রাকট শ্রমিক হিসাবে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই এ আই ইউ টি ইউ সি পরিচালিত ইউনিয়নের সদস্য হন। ধীরে ধীরে তিনি সংগঠক হয়ে ওঠেন। ঐ দিনই থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের সদস্যদের নিয়ে বাসে করে ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি পার্লামেন্ট অভিযানে যোগ দেন। ফরিদাবাদ হয়ে ফেরার পথে পলোয়ান শহরে ন্যাশনাল হাইওয়ে পার হতে গিয়ে দ্রুতগামী একটি গাড়ির তলায় পিষ্ট হন। সহকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার সংবাদ দিল্লি অফিসে পৌঁছানো মাত্রই এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্ব উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সহকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তদারকি শুরু করেন। সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে রাত দু'টোয় কমরেড গড়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ হয়ে যায় দক্ষ সংগঠক হয়ে গড়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। সংবাদ পেতেই সর্বত্র নেমে আসে শোকের ছায়া।

ময়না তদন্তের পর কমরেড পিরুল গড়াইয়ের মরদেহ দিল্লির কমরেডরা ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে নয়াদিল্লিতে নিয়ে আসেন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা, দলের দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল, এ আই ইউ টি ইউ সি-র দিল্লি রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড হরিশ ত্যাগী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য প্রয়াত কমরেডের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। কমরেড শঙ্কর সাহা তাঁর শোকবার্তায় প্রয়াত কমরেড পিরুলের পরিবার ও তার গুণগ্রাহী সকল মানুষ এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত কমরেডের মরদেহ নিয়ে আসা হয় পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে। হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মানুষ সমবেত হন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ডি কে মুখার্জী, কমরেড সমর সিনহা, কমরেড এম কে সিনহা ও এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পুরুলিয়া জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক বিশাল শোকস্তব্ধ মিছিল করে কমরেড গড়াইয়ের মরদেহ তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কমরেড পিরুলের মা, বাবা, বড় ভাই সহ পরিবার ও উপস্থিত সকলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সহস্রাধিক মানুষের চোখের জলের মধ্য দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড পিরুল গড়াই লাল সেলাম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বুর্জোয়া শাসন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন

খালেকুজ্জামান

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এ দেশে এলে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁকে কিছু বলার জন্য এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। সেই মতো ১৩ ডিসেম্বর '১০ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে একটি সভায় তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন। কয়েকটি কিস্তিতে তা আমরা প্রকাশ করছি।

এটি চতুর্থ ও শেষ কিস্তি। তৃতীয় কিস্তিতে আলোচিত হয়েছে — বাংলাদেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে 'বাসদ'-এর প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে নানা নীতিগত ও পদ্ধতিগত প্রশ্নে অন্যান্যদের সাথে মতাদর্শগত বিতর্ক, ও দেশের 'কমিউনিস্ট পার্টি' বলে পরিচিত পার্টিটির ভ্রান্ত লাইন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র, বাংলাদেশের অর্থনীতি, শ্রমিক-চাষির অবস্থা, ইত্যাদি।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এ সময়ে আমাদের দেশে দুই বুর্জোয়া দল, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করে জনগণকে একবার চুলার আগুনে পোড়াচ্ছে, আবার তপ্ত কড়াইতে ভেজে নিচ্ছে। ১৯৭১ সালে যে আলবদর-রাজাকার-আলশামস, অর্থাৎ স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক শক্তিকে আমরা পরাস্ত করলাম, সেটা ওই বিএনপি-র কাঁধে, আর ১৯৯০ সালে যে স্বৈরাচারের আমরা পতন ঘটালাম তা আওয়ামী লীগের কাঁধে চড়ে আছে। এরাই আবার কে স্বাধীনতার জনক, কে ঘোষক, কে কত বেশি মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার তা নিয়ে ঝগড়া করছে। এখন এরা কী করছে? কত সমস্যা দেশের মানুষের। সব চাপা দিয়ে খালেদা জিয়ার বাড়ি থাকবে কি থাকবে না, পার্লামেন্টের সামনের সিটে কে বসবে, ক'জন বসবে, এই বিতর্কে ফাঁসিয়ে দিয়ে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এর আগে শেখ হাসিনা আপন বোন শেখ রেহানার নামে একটা বাড়ি দিয়েছিল, খালেদা ওটাকে উচ্ছেদ করে থানা বানিয়েছিল। এবার হাসিনা খালেদাকে উচ্ছেদ করেছে। অন্যায্য হলে উচ্ছেদ তো হতেই পারে, কিন্তু কোর্টে একটা হিয়ারিং-এর তারিখ ছিল, তার জন্য অপেক্ষা করা দরকার ছিল। তা না করে পাল্টাপাল্টিতে আসলে দু'জনেই লাভবান হচ্ছে। একজন বলছে, এ বাড়িতে চল্লিশ বছর ধরে আছি, তৎকালীন সরকার বরাদ্দ দিয়েছে, স্বামীর স্মৃতি এবং আবেগ রয়েছে এর সাথে — এসব বলে কান্নাকাটি করছে, প্রচার মাধ্যম তার প্রচার দিয়েছে। আবার সরকারি দল বলছে, এটা মিলিটারির সম্পত্তি, তুমি কেন ক্যান্টনমেন্টে বসে রাজনীতি করবে? এই যে বিতণ্ডাটা — এর অর্থ কী? কোথায় গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি, কোথায় আমাদের ফুলবাড়ির কয়লা, কোথায় জনগণের সমস্যা? ফুলবাড়ির কয়লা এক নম্বর কোয়ালিটির কয়লা, মার্কিন-ব্রিটিশ মালিকদের ভুয়া কোম্পানিকে দেওয়া হচ্ছে এই শর্তে যে আমরা রয়্যালটি পাব ৬ পার্সেন্ট, আর ৯৪ ভাগ ওরা নেবে। এটা ঠেকাতে গিয়ে ২০০৬ সালে আন্দোলন করে তিনজন মানুষ শহিদ হয়েছেন। আমরা এবার ২৪-৩০ অক্টোবর এক সপ্তাহে সাড়ে চারশো কিলোমিটার ঢাকা-দিনাজপুর-ফুলবাড়ি লং মার্চ করেছি। আমাদের দলের ১০০ জন মহিলা সাড়ে চারশো কিলোমিটার লং মার্চ করেছেন। এর মধ্যে মাত্র দেড়শো কিলোমিটার গাড়ি করে গেছেন।

এরা গভীর সমুদ্রে দুশো কিলোমিটার দূরে গ্যাস ব্লক মার্কিন কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে। অথচ আমাদের ভূমিতে গ্যাস আছে। সুনামগঞ্জ থেকে শুরু করে নেত্রকোনা পর্যন্ত ৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস মাটির নিচে মজুত থাকার প্রমাণ মিলেছে। এগুলো তুলবে না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা, বাপেক্স এগুলো তুলতে পারে, তা করবে না। ১৭টা কূপ খনন করেছি আমরা, একটাতেও আগুন ধরেনি। আর আমেরিকান কোম্পানি অক্সিডেন্টাল সিলেটের মাগুরছড়ায় আগুন লাগিয়ে ৭ হাজার কোটি টাকার গ্যাস পুড়িয়ে ফেলেছে। কানাডীয় কোম্পানি নাইকো টেংরাটিলায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেখানেও আমাদের প্রায় ৮-১০ হাজার কোটি টাকার গ্যাস পুড়িয়েছে। সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে কোনও আলোচনা নাই। টিপাইমুখের যে বাঁধ পরিকল্পনা সেটা নিয়েও আমরা কথা বলেছি। এ বাঁধ যদি হয়, মেঘনা-সুরমা-কুশিয়ারা ধ্বংস হবে। মণিপুর রাজ্য সরকার ১৯৯৭ সালে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করেছিল এই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে। তারপর ২০০৩ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের উদ্বোধন করার কথা ছিল কিন্তু উদ্বোধন হয়নি। ২০০৬ সালে গিয়ে আপনাদের বিদ্যুৎ ও ভারী শিল্পমন্ত্রী দু'জন গিয়ে উদ্বোধন করেন। এ নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর কোনও কথা নেই। আমাদের উভয় দেশের ছিটমহল বিনিময়ের কোনও সুরাহা হল না। সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। আমাদের ল্যান্ডে যা জমি, সমুদ্র তার চেয়ে বেশি। দু'লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা আমরা পাই। তার মধ্যে বার্মা এবং ভারতের যে ম্যাপ সাবমিট করা হয়েছে, তাতে প্রায় ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের থাকবে না। এর কোনও কিছুই আলোচনায় নেই। এখানে বিতর্ক হল খালেদার বাড়ি, পার্লামেন্টের সামনে আসন ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে দু'জনে যুদ্ধ লেগেছে, কিন্তু দু'জনেরই লাভ হচ্ছে এখানে।

ফলে আওয়ামী লীগ পুশ করছে বিএনপি-কে যে তুমি বাড়ির আন্দোলন কর, তাহলে তোমাদের আন্দোলনের ভাবমূর্তি এবং সরকারের গণতান্ত্রিক সহনশীলতা উজ্জ্বল হবে, আবার মানুষের জঙ্গি অংশগ্রহণও হবে না, অন্যদিকে আমরা দু'জনে মিলে বিতণ্ডা করলে মূল ইস্যু চাপা পড়ে যাবে। বিএনপি বাড়ি ও আসন সংখ্যার সাথে নামকাওয়াস্তে কিছু জনজীবনের সমস্যা জুড়ে দিয়েছে যা তাদের মুখ্য বিষয় নয়। এদিকে দেশে দুই জন কোটিপতি থেকে তিরিশ হাজার কোটিপতি হয়েছে। ৩৬ পরিবার গজিয়েছে বাংলাদেশে, আপনারা ভাবতে পারেন? এত অল্প সময়ে! এই ৩৬ পরিবারের কারও রানিং ক্যাপিটাল একহাজার কোটি টাকার কম নয়। তার পাশে তো দেশের মানুষের বেহাল অবস্থা। দু'কোটি লোক ছিন্নমূল। বাড়িঘর নেই, সংসার নেই, কিচ্ছু নেই। চার কোটি-সাড়ে চার কোটি বেকার, ৬০ ভাগ নিরক্ষর, ৫৪ ভাগ চিকিৎসা পায় না। এ পরিসংখ্যান দিয়ে তো শেষ করা যাবে না। এইরকম পরিস্থিতি। আর তার সঙ্গে অবক্ষয়। ৮০ ভাগ মাদকাসক্ত। সেটাও আমরা বলেছি যে, এই সেই বাংলাদেশ, ১৯৭১ সালে ৯ মাস কোনও সরকার ছিল না। ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তারা মানুষ খুন করছে। আর বাংলাদেশের সরকার ছিল প্রবাসী, তারা দেশে ছিল না। জিনিসের দাম বাড়েনি। যুদ্ধ চলছে, রাস্তাঘাট ঠিক নেই, ব্রিজ ভাঙা। সে অবস্থায় ডাকাতি নেই, চুরি নেই, খুন-খারাপি নেই, ধর্ষণ নেই, কিচ্ছু নেই। অপরাধ করেছে ওই রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা। স্বাধীনতাকামী বাঙালি নয় মাসে কোনও অপরাধ করেছে কোনও জায়গায় তার একটা দৃষ্টান্ত নেই। কীভাবে মানুষ পাল্টে গিয়েছিল! কী জাগরণ মানুষের মধ্যে হয়েছিল! কী অভাবনীয় মূল্যবোধ সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল! সব ধ্বংস করেছে ৪০ বছরে। এখন কিশোর তরুণ ছেলেরাই হয়েছে ইভটিজার, বখাটে। এরা তাদের বোন কিশোরীদের উত্যক্ত করে, আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়। ২২টা মেয়ে গত এক বছরে আত্মহত্যা করেছে। অথচ এ যুবক-তরুণরাই ১৯৭১ সালে মা-বোনের সম্ভ্রমের জন্য প্রাণ দিয়েছে। একটা এলাকায় তো আমি নিজে সাক্ষী হয়ে আছি। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দালালরা যুবতী মেয়েদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছিল। ৩০টা ছেলে বুকের রক্ত ঢেলে দিল। ওরা জীবন দিয়ে মেয়েদের রক্ষা করেছে। তাহলে '৭১ সালে এই যুবক, এই তরুণ, এই কিশোর, তারা এভাবে অকাতরে জীবন দিল মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য। আর আজ ৪০ বছর পরে এই ছেলেরা মাদকাসক্ত হয়, ওরা মেয়েদের নির্যাতন করে, ওরা মেয়েদের রেপ করে, এটা কী করে সম্ভব? কে এদের এমন করেছে? তার মানে এই বুর্জোয়া শ্রেণীশাসন মানুষকে শুধু অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র বানায়নি, তাদের গৃহহীন, ছিন্নমূল করেনি, তাদের চরিত্র কেড়ে নিয়েছে। তাদের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছে। সমস্ত দিক থেকে মানুষকে অমানুষের জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে। বুর্জোয়াদের এটা প্রয়োজন। এ জায়গায় নামাতে না পারলে ওদের শাসন চলবে কীভাবে? মানুষকে পশুর স্তরে নামাতে না পারলে পশুর মতো কাজ করানো যাবে কীভাবে? সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে শোষণ-নির্যাতন চালাবে কীভাবে?

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঢাকায় শহিদ বেদিতে মাল্যদান করছেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান

'মৌলবাদ মৌলবাদ' বলে যে কথাটা অনেকে বলছে, বাংলাদেশে মৌলবাদের বাস্তবে তেমন জায়গা-টায়গা নেই। শাসকগোষ্ঠী ওদের উসকায়, তৈরি করে। আন্তর্জাতিকভাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ মৌলবাদের স্রষ্টা। আর দেশের মধ্যে শাসকশ্রেণী হল এই মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক এবং স্রষ্টা। আফগানিস্তানে কী হয়েছিল? এই যে ওসামা বিন লাদেন, সে ছিল কন্ট্রাকটর। ১২টা মুসলিম দেশ থেকে এক লক্ষ মুসলিম ভলান্টিয়ার জোগাড় করা এবং তাদের তালিবান বানানো — এটা কে করেছিল? আমেরিকা করেছিল পাকিস্তানকে দিয়ে। তারপরে বিভিন্ন দেশ থেকে রিক্রুট করা, তাদের গোপন অস্ত্র দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে, বিভিন্নভাবে এ কাজগুলি আমেরিকা করেনি? আমাদের দেশ থেকে যেগুলি গিয়েছে পাকিস্তানে, এখন তো সেগুলি সব বেরোচ্ছে — কীভাবে টাকাপয়সা দিয়ে তাদের সেখানে নিয়ে গেছে। ব্রিটিশ, আমেরিকান ট্রেনাররা, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর লোকেরা সব ট্রেনিং দিয়েছে তাদের। বাংলাদেশে বাংলাভাই কি টিকল? একটা পরিস্থিতিতে তারা এই তথাকথিত বাংলাভাইকে দিয়ে বামপন্থী নিধনের ব্যবস্থা করছিল। পরে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের দানবে পরিণত হওয়ার পর জেলে নেওয়া, শাস্তি দেওয়া হয়। তারপর যে আন্দোলন করতে চাইবে তাকেই দমন করা, করতে করতে এমন জায়গায় গেল যে কথিত গুম-খুন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ধরে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। তাতেও যখন হল না, তখন ইনসারজেন্সির আর একটা রূপ বের করল যে, মৌলবাদীদের দিয়ে নকশালদের খতম কর। আগে ওদের নিজেদের মধ্যে লাগিয়ে দিত, লাগিয়ে খুন-খারাপি চালাত, এখন এই কৌশল নিয়েছে। কিন্তু এই বাংলাভাই কি দাঁড়াতে পারল? গভর্নমেন্ট যে ফাঁসি দিল, সেটা নিজেদের ইচ্ছায় দেয়নি, দিয়েছে জনমতের চাপে। তারপর জামাতে ইসলামী, সবচেয়ে সংগঠিত মৌলবাদী শক্তি — পারল দাঁড়াতে? চল্লিশ বছর এদের কোনও বিচার করল না। কেন করল না? কারণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বন্দুকের, কারণ তারা ছিল পাকিস্তানের দালাল। আর এদের খতম না করলে বাঙালি বুর্জোয়ারা দাঁড়াতে পারবে না। এই জন্য বন্দুকের সম্পর্ক ছিল। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পুঁজিবাদী বাজারে তারা একে অপরের পার্টনার, সেইজন্য মৌলবাদী আর জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের মধ্যে বন্দুকের সম্পর্ক বান্ধবের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। তা না হলে কেন এই চল্লিশ বছর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলেন না? স্বাধীনতার পরে বাহাত্তর সালে যুদ্ধাপরাধীর একটা তালিকা হয়েছিল ১৯৫ জনের। একটাও বাঙালির নাম নেই। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন, পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আজিজ — এই তিন জন মিলে একটা এগ্রিমেন্ট করে ওদের পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছিল। কেন? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু আমরা বলছি যে, আওয়ামী লীগের সে রাইট নেই, ত্রিশ লাখ মানুষ যারা হত্যা করেছে, তাদের মাফ করার ক্ষমতা কোনও দলকে কেউ দেয়নি। সেই জন্য এবার আবার দাবি উঠেছে। কিন্তু সেখানেও আমরা বলছি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আর সাধারণ খুনখারাপির বিচার একরকম হয় না। হিটলার কোনও লোককে নিজের হাতে খুন করেনি। মুসোলিনি কোনও লোককে খুন করেনি। গোলাম আজম কাউকে সরাসরি খুন করেনি। তাহলে, যুদ্ধাপরাধী তিন প্রকারের আছে। যারা গণহত্যার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকারী, তারা এক নম্বর যুদ্ধাপরাধী, তাদের নাম আজ পর্যন্ত ঘোষিত হয়নি। যারা গণহত্যার জন্য সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করেছে এবং সেই বাহিনী পরিচালনা করেছে, তারা হচ্ছে দু'নম্বর যুদ্ধাপরাধী। তাদের কথাও বলা হয়নি। তৃতীয় হচ্ছে, তদন্ত কমিটি করে দেখা গেল স্বহস্তে কারা আগুন লাগিয়েছে, ধর্ষণ করেছে, মানুষ খুন করেছে। এটা না করে একটা বারগেইন করা, নির্বাচনী ফয়দা তোলা, এভাবে যদি এটা ব্যবহার করা হয় বা নামকাওয়াস্তে কয়েকজনের বিচার করে আবারও ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করা হয়, তার মানে কী দাঁড়াবে?

পাঁচের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বুর্জোয়া শাসন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন

চারের পাতার পর

আওয়ামী লীগ সম্পর্কে একটা ইলিউশন (মোহ) আছে, ভারতেও আছে, যে এরা সেক্যুলার ফোর্স। আমি একটা উদাহরণ শুধু বলব। কারণ এমনিতেই অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি। ২০০৫ সালে আওয়ামী লীগ একটা মৌলবাদী দলের সঙ্গে চুক্তি করেছিল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। চুক্তির বিষয়গুলি শুনুন, কীরকম সেক্যুলার তারা। আওয়ামী লীগ-খেলাফৎ মজলিশের চুক্তি। (১) পবিত্র কোরান, সুন্নাহ ও শরিয়ত বিরোধী কোনও আইন প্রণয়ন করা হবে না; (২) কওমী মাদ্রাসার সনদে সরকারি স্বীকৃতি যথাযথভাব বাস্তবায়ন করা হবে; (৩) আইন প্রণয়ন করা হবে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঃ- (ক) হজরত মহম্মদ (সঃ) শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবি; (খ) সনদ প্রাপ্ত হাক্কানী আলেমগণ ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবেন, সনদ বিহীন কোনও ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করতে পারবেন না; (গ) নবি, রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা ও কুৎসা রটনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই হচ্ছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ওই মৌলবাদী সংগঠনের চুক্তি। তারপর বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করলেন। সারা দেশে প্রতিবাদের মুখে শেখ হাসিনা বললেন, না এগুলি এখন আর কার্যকর নেই। কার্যকর নেই তো করলেন কেন? তারপরও এদের কাছে কেউ সেক্যুলারিজম আশা করে? আমরা ওই বুদ্ধিজীবীদের অনেককে সেদিন বলছিলাম, আপনাদের কি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে বা অনুভব শক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে? বোঝেন না এগুলির পরিণাম কী? মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানিরা যা করেছে আপনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির পরিচয় দিয়ে তার চেয়েও ক্ষতি করেছেন। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান সংবিধানে ধর্মীয় একটা প্রতারণা হিসাবে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বসিয়ে দিয়েছিলেন টাইটেলে। আর এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছে। একটা বামপন্থী পার্টিও স্পষ্ট করে কথা বলছে না। বুর্জোয়ারা তো বলেই না। আমরা পরিষ্কার বলেছি যে, সংবিধান কোনও ধর্মগ্রন্থ নয়। আর কোরান শরীফের পরে মুসলমানের প্রধান হাদিস গ্রন্থ বোখারি শরীফ, তা এক নম্বরে গণ্য হয়। ওই বোখারি হাদিসের শুরুতে বিসমিল্লা নেই। হজরত মহম্মদ মদিনা সনদ নামে যে চুক্তি করেছিলেন, তাতে বিসমিল্লা নেই। উনি ওনার জীবনের শেষ ভাষণ, বিদায় হজের ভাষণ নামে যা বিখ্যাত, এর শুরুতেও বিসমিল্লা বলেননি। তাহলে আমাদের এখানে বিসমিল্লা কেন? এটাও বলার সাহস ওদের নেই।

এমনিতেই সংবিধানে অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল। বাঙালি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরি, এইরকম ৪৮টির মতো জাতিসত্তা, সবাই মিলে আমরা যুদ্ধ করেছি। কিন্তু যেহেতু ৯৯.৮ ভাগই বাঙালি, তাদের নামেই জাতি হয়েছে। কিন্তু এরা সবাই আমাদের জাতির অন্তর্গত। তাদের আমরা সাংবিধানিক কোনও স্বীকৃতি দিলাম না, যদিও তাদের কৃষ্টি, ভাষা, ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তাদের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বিশেষ রাষ্ট্রীয় পরিচর্যা দেওয়া দরকার ছিল, স্বীকৃতি দেওয়া দরকার ছিল, তা নেই। গণতান্ত্রিক সংবিধান বলা হচ্ছে, কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পত্তির অধিকার সমান নয়। ছেলে হোক মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট — প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সন্তান যদি মেয়ে হয়, তাহলে সম্পত্তি পাবে ছেলের অর্ধেক। হিন্দু মেয়েদের তো সম্পত্তিতে অধিকারই নেই। ভারতে এই প্রথা রদ করা হয়েছে। বাংলাদেশে তা হয়নি। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধানই যদি মানতে হয়, তাহলে এটা ডেমোক্রেটিক হয় কী করে?

আর মৌলিক অধিকার ৬টা — অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং কাজ। এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার চ্যাপ্টারে ঢোকায়নি, এটা মুখবন্ধে আছে। মুখবন্ধে রেখে লাভ কী? মৌলিক অধিকারের চ্যাপ্টারে থাকলে তখন এটা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক হয়। তখন আমি যদি খাওয়া না পাই, আমি আদালতে মামলা করতে পারি। আমি যদি লেখাপড়া না পাই, আদালতে যেতে পারি। কিন্তু যদি এটা মৌলিক অধিকারের চ্যাপ্টারের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে এটা গভর্নমেন্টের একটা ইচ্ছা, অভিলাষের মাঝে থাকে, বাধ্যবাধকতা হয় না। যদিও দুনিয়ার দেশে দেশে সংবিধানের অনেক অঙ্গীকারই শাসকগোষ্ঠী নির্বিঘ্নে লঙ্ঘন করে চলে, কেউ গোপনে কেউ খোলামেলা। আমাদের শাসকরা খোলামেলাই তা করছে। সংবিধানে এক ধারার শিক্ষার কথা বলা আছে কিন্তু চলছে তিন ধারা — সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা। সংবিধানে বলা আছে, কেউ অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে পারবে না, কিন্তু প্রতিবছরই বাজেটে কালো টাকা সাদা করা হয়। এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এসব আমরা বলেছি। এসব ক্ষেত্রেও আমাদের একটা বিশিষ্টতা একভাবে জনগণের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে।

আমরা বুর্জোয়া শাসনের এই চল্লিশ বছরের ইতিহাস তুলে ধরে বলতে চাইছি, আর কতকাল চলবে সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর পুঁজিবাদের এই ধ্বংসলীলা? এই বুর্জোয়ারা কী করেনি? খালি অর্থনৈতিক অভাব দেখছেন, গোটা জাতিকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছে তারা, আপনার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ কি আর আছে? এই সোনার ছেলেরা জীবনবিমুখ হয়ে মাদকাসক্ত হচ্ছে, এরা নারী নির্যাতন করছে এবং এরা অপসংস্কৃতির শিকার হচ্ছে। পর্নোগ্রাফির এমন ছড়াছড়ি যে মানুষকে আর মানুষ রাখা যাবে না। কোনও পরিবার শান্তিতে নেই, ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলছে। সেগুলি আমরা বলেছি। আমাদের পার্টি বলছে যে, পরিবারের মধ্যে সংগ্রাম লাগবে। আমরা আপনাদের অর্থনৈতিক সংকট দূর করে দিতে পারব না। কিন্তু এই আদর্শে বিশ্বাসী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা সহমর্মিতা, এক ধরনের সৌহার্দ্য, উন্নত একটা জীবনের ছবি ভেসে উঠবে। অন্তত এই মানসিক স্বস্তি নিয়ে বাঁচতে পারবেন, ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে পারবেন। তা ছাড়া উপায় নেই। অনেকে বলছে যে, আমরা নাকি দলের নেতা-কর্মীদের সম্পত্তিমুক্ত থাকার অবাস্তব কথা বলছি। বাস্তবে আমরা যা বলতে চাইছি তাহলো যারা এই দল পরিচালনা করবে, নেতৃত্ব দেবে, অর্থাৎ নীতি নির্ধারণী সংস্থা বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থাকবে তারা অন্তত আগামী দিনের সমাজের ছবিকে নিজের মধ্যে ধারণ করবেন। যেমনি করে সূর্য তার আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ নিয়ে প্রভাতের শিশির বিন্দুতে প্রতিফলিত থাকে। কারণ, আমরা যা ভবিষ্যতে করবো আজকে তার সাক্ষ্য কে দেবে? শুধু মুখের কথা? এটা যেমন সত্য তেমনি নেতৃত্বের বাইরের সবাইকে একযোগে বিদ্যমান ব্যবস্থায় টেনে আনাও বাস্তবতাবর্জিত কথা। তবে দিনে দিনে সংগ্রাম যতো অগ্রসর হবে সংগ্রামী শক্তির অঙ্গীকার উৎকর্ষও তেমনি ওপর থেকে নিচে পড়তে থাকবে। তখনই মানুষ মূর্ত রূপে বুঝবে মুক্তির মন্ত্র, সমাজতন্ত্র। অন্যেরা যখন বলছেন, তাঁদের দল এখন বৃদ্ধদের বৈঠকখানায় পরিণত হয়েছে, যৌবন-তারুণ্যের সংযোগ তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন, তখন আমাদের দলে হাজার হাজার কিশোর, তরুণ, যুবক এসে যুক্ত হচ্ছে। ৮-১০ বছরের শিশু থেকে ৭০-৮০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত ফাঁক নেই, স্থবিরতা নেই। জীবনের প্রবাহ, এক জাগরণ এখানে দেখতে পাবেন। চা শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিকসহ শ্রমজীবী মানুষেরাও মর্যাদা ও মুক্তির সন্ধানে আসছে। তবে ৬ কোটির ওপরে শ্রমশক্তির একটা বড় অংশকে কি আমরা যুক্ত করতে পেরেছি? তা পারিনি। তবে ভগ্নাংশ করে হলেও এগোচ্ছে। এজন্যই শাসকগোষ্ঠীর আঘাত আমাদের ওপর দিন দিন তীব্র হয়ে আসছে। মিডিয়ার ব্ল্যাক আউটে তো আমরা আছিই। এখন ভিতরে বাইরে নানা দিক থেকে ওরা লেগেছে। কিন্তু আমরা বলেছি, ভিতর থেকে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা-ভ্রান্তি-বিচ্যুতির কারণে যদি আমরা ধ্বংস না হই তবে বাইরের আঘাতে এই দলকে ধ্বংস করার দিন শেষ হয়ে গেছে।

এখানে কৃষক আন্দোলনের কথা একটু বলি। ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিএফ), টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও দুঃস্থ ভাতা ইত্যাদি নামে সরকারি বরাদ্দে যে দুর্নীতি, এটা প্রথম আমাদের পার্টি ধরেছে। এবং বিবিসি থেকেও নিউজ হয়েছে। কিছু জায়গায় ধরার ফলে এটা নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এবং কৃষকদেরও দৃষ্টিটা এদিকে আসছে যে, এই একটা পার্টি, তারা এখানে এসে চেয়ারম্যানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে না বরং সে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আমরা সিন্ডিকেটের লুটপাট দেখিয়েছি। ১০-১২টা আমদানিকারক বৃহৎ কোম্পানি ও আরও ১০-১২টা একচেটিয়া কারবারী মিলে যে লুটপাট করছে তা সীমাহীন। যেমন ধরুন, দেশে প্রতিদিন ৭ কেজি চাল বাজারে বিক্রি হয়। ১০ টাকা করে দাম বাড়িয়ে দিলে দিনে ৭০ কোটি, বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকা ওদের পকেটে চলে যায়। এরমধ্যে খুচরা ব্যবসায়ী ও ছোটখাটো মধ্যসত্বভোগীদের হাতে যায় ৫-৬ হাজার কোটি টাকা। এভাবে ডাল, তেল, পেঁয়াজ, রসুনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তারা ৪ থেকে সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। এই খুঁটির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ইত্যাদি বুর্জোয়া দল। বছরে রাষ্ট্রের বাজেট হয় দেড় লক্ষ কোটি টাকা আর সিন্ডিকেটের হাতে জমা হয় ৪-৫ লক্ষ কোটি টাকা। এটাই কালো অর্থনীতির কালো টাকা।

দেশের ৫০ ভাগ নারীসমাজকে বাদ দিয়ে তো সমাজের রূপান্তর সম্ভব নয়। আবার যেভাবে নারীর ওপর সহিংস নির্যাতন বেড়ে চলেছে তাতে প্রতিরোধের শক্তি না বাড়লে এই অত্যাচারের শক্তিকে দুর্বল করা যাবে না। সে লক্ষ্যে আমাদের কাজ এগোচ্ছে। (আগামী জানুয়ারি মাসের ১৩ তারিখে আমাদের মেয়েদের সংগঠন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের একটা সম্মেলন হবে। আমরা আশা করি ৫-৬ হাজার মেয়ে জমায়েত হবে।) মুসলমানদের মেয়েদের ঘরের বাইরে বের করে আনা কী কঠিন কাজ, এটা ঠিক এখানে বসে আপনারা বুঝতে পারবেন না। একটা বাড়িতে ঢোকা যায় না, অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলা যায় না, এমন রক্ষণশীল। কিন্তু এবারের লং মার্চে ১০০ জন মেয়ে ছিল। ১০-১৫ জন এদের মধ্যে 'পিঠে ছালা বেঁধে' এসেছিলেন — বাড়ি ফিরলে তো মার খাবেই। তা সত্ত্বেও এসেছেন। মার খেয়েওছেন অনেকে। দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং দলের প্রভাবে অনেক পরিবারে পরিবর্তন আসছে। এ জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছে পার্টি।

আমরা এর পরে কৃষকদের সমাবেশ করবো। শ্রমিকদের বড় জমায়েত করবো। সাংস্কৃতিক সম্মেলন সপ্তাহব্যাপী করার চিন্তাও রয়েছে। এগুলো শুধু সমাবেশের জন্য সমাবেশ হবে না, শক্তি সমাবেশ ঘটিয়ে প্রতিরোধের ধারায় যদি আমরা অগ্রসর হতে পারি, তাহলে এখন বাংলাদেশের মানুষের সামনে যে ভবিষ্যৎ- ভরসা বলে কিছু নেই — এ অভাবটা কাটবে। বামপন্থীদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ঐতিহ্যগত কারণে একভাবে টিকে আছে। আর আমরা ভিন্ন ভাবমূর্তি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। ফলে একদিকে সোস্যাল ডেমোক্রেসির ধারা অন্যদিকে সর্বহারা বিপ্লবী ধারা, এ দুটোই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে যে কারা সামনে যাচ্ছে, কাদের নেতৃত্বে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, শোষিত মানুষের সংগ্রাম গড়ে উঠছে।

বুর্জোয়ারা আজ একটা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে যে, ২০২১ সালে তারা বাংলাদেশে কবরের শান্তি রচনা করবে। আন্দোলনের শক্তি থাকবে না, প্রতিবাদের শক্তি থাকবে না, অবক্ষয়ের জোয়ারে ভাসতে থাকবে মানুষ। আমরাও পাল্টা বলেছি যে, ২০২১ সালে হয় তাদের ক্ষমতার মসনদ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে, আর না হলে সমস্ত বুর্জোয়া শক্তি এক কাতারে দাঁড়িয়ে তাদের সামনে যে শক্তিকে দেখবে, সেটা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, এটা জেনে রাখুন। এবং সেটা নিয়েই আমরা আপনাদের সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি হিসাবে, আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনা ও দায়িত্ববোধ থেকে অধিক সংহতি আশা করি। একটা দেশের বিপ্লব, সারা বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রেরণা জোগায়। পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলন ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে যেমন অনেক বেশি উদ্দীপ্ত করবে, ভারতবর্ষের বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশ ছাড়া বাংলাদেশের বিপ্লবকে রক্ষা করাও কঠিন হয়ে যাবে। ফলে সেদিক থেকে আমরা, বাংলাদেশের মানুষ এখন মনে করি আমরা একা নই। ভারতবর্ষ একটা আধিপত্যের শক্তি হিসাবে যেভাবে দাঁড়াচ্ছে, ওই দেশের জনগণ, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কর্মী-নেতা দাঁড়াবে বাংলাদেশের জনগণের বিপ্লবের পক্ষে। এটাই তো ভরসা। কমরেড প্রভাস ঘোষ বাংলাদেশে গিয়ে সংহতি বক্তৃতায় যেটা বলছিলেন, সেটা যে কীভাবে মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে সেটা উনি নিশ্চয়ই অনুভব করে এসেছেন।

কমরেডস, এই কথা বলেই, দীর্ঘক্ষণ আপনারা যে কথা শুনেছেন, আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-বাসদ
সংহতি জিন্দাবাদ।
সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ।
কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম।
জয় সমাজতন্ত্র। জয় সর্বহারা।

কামারপুকুরে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রতিবাদ অ্যাবেকার

হুগলি জেলার মগরা, চন্দননগর, তারকেশ্বর এবং আরামবাগ এই ৪টি ডিভিসনের বিভিন্ন গ্রুপ সাপ্লাই অফিসে শত সহস্র মানুষের লাগাতার আন্দোলনের চাপে বিদ্যুৎ কোম্পানিকে ঘোষণা করতে হয় যে, তারা ২০০৭-২০০৯ সালের বিলের টাকা দাবি করবে না, শুধু ২০১০ সালের টাকা মেটাতে হবে। হুগলি জেলার আরামবাগ ডিভিশনের কামারপুকুর গ্রুপ সাপ্লাইয়ের গ্রাহকরাও নানা বৈষম্যের বিরুদ্ধে অ্যাবেকার নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। এলাকার কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা অ্যাবেকার শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে সদস্যদের বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে গাছ কাটার মিথ্যা মামলা করে এবং স্থানীয় সভাপতির বাড়ি ভাঙচুর করে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৫ ফেব্রুয়ারি জেলা সভাপতি প্রদ্যুৎ চৌধুরী, জেলা সম্পাদক মণিমোহন ঘোষের নেতৃত্বে স্থানীয় নেতা প্রবীর ভক্ত, সাদেক আলি এবং হিমাংশু রায় সহ শত শত বিদ্যুৎগ্রাহক ডিভিশনাল ম্যানেজার অফিস ঘেরাও করেন। আরামবাগ থানা বিশাল সশস্ত্র পুলিশবাহিনী দিয়ে ঘেরাও তুলতে চেষ্টা করেও বিক্ষোভকারীদের মনোবল দেখে পিছু হটে। শেষ পর্যন্ত ডিভিশনাল ম্যানেজার অ্যাবেকার দাবি মেনে কাটা সমস্ত লাইন নিঃশর্তে জুড়ে দেওয়ার এবং নতুন করে লাইন না কাটার প্রতিশ্রুতি দেন। সমস্ত কেস তুলে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়ার এবং থানাকে ফোন করে পুলিশি তৎপরতা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও ওঠে।

আরব ভূখণ্ডে আন্দোলনের সাইক্লোন

একের পাতার পর

বিরুদ্ধে ও অন্যান্য দাবিতে মানুষ সোচ্চার হয়েছে। অন্যান্য আরব দেশগুলিতেও একই অবস্থা। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ এবং সামরিকতন্ত্রের মদতপুষ্ট একদলীয় শাসন বা রাজপরিবারের শাসনের বিরুদ্ধে এইসব দেশগুলিতে প্রতিবাদের সাইক্লোন বইছে। কামান, বন্দুক, গোলাবারুদ কোনও কিছুই পরোয়া করছে না নিরস্ত্র জনতা।

এই আন্দোলনের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে একদিকে ক্ষমতাসীন সরকারের নির্মম স্বৈরশাসনের অবসান, অন্যদিকে জনজীবনের তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান। আন্দোলন যেভাবে চলছে, শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিহত করে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বেন আলি বা হোসনি মুবারকের মতো অন্যান্য স্বৈরশাসককেও হয়তো ক্ষমতা ছাড়তে হতে পারে, হয়তো শাসকগোষ্ঠী কিছু প্রশাসনিক সংস্কার, কিছু সাংবিধানিক সংস্কার করতে বাধ্য হতে পারে এবং এটুকু হলেও নিঃসন্দেহে তা আন্দোলনের এক ধাপ অগ্রগতি — যাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। কারণ এটুকু হলেও আরব দুনিয়ায় এইসব স্বৈরশাসকদের মাধ্যমে চলা সাম্রাজ্যবাদের বজ্রমুষ্ঠি কিছুটা হলেও শিথিল হবে, কিছুটা গণতন্ত্রের বাতাস বইবে, যা অবশ্যই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য জয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

কিন্তু যে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন সেই তীব্র দারিদ্র, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি মিটবে কি? এই সংকটগুলির উৎস কী? এই সংকটের উৎস বিদ্যমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ মানেই হল এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক যেখানে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই উৎপাদনের উদ্দেশ্য। এই মুনাফার অর্থনীতিই নিয়ে আসে শোষণ, লুণ্ঠন, আর তার পরিণামে আসে দারিদ্র, তীব্র বেকারি সহ জীবনের সকল সংকট। ইউরোপে এই পুঁজিবাদ এসেছে ৩০০/৪০০ বছর আগে। সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতেই সমাজবিকাশের ধারাবাহিকতায় এসেছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী পথে সমাজের অগ্রগতি ঐতিহাসিকভাবে যতটুকু হওয়া সম্ভব হয়েছে। পুঁজিবাদ তার শৈশব-কৈশোর-যৌবন অতিক্রম করে আজ বার্ধক্যে উপনীত। পুঁজিবাদ আজ ক্ষয়িষ্ণু, মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই স্তরে পুঁজিবাদ আর সমাজের অগ্রগতি ঘটাতে পারে না, সংকট ছাড়া কল্যাণকর কিছু দিতে পারে না।

এই পুঁজিবাদেরই শিরোণাম আমেরিকা আজ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত। ২০০৯ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী, এই দেশের ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ নাগরিক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। অর্থনৈতিক মন্দায় গত তিন বছরে এই দেশের ৮০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা রয়টারকে উদ্ধৃত করে এ রাজ্যের বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি পর্যন্ত লিখছে, 'নিউইয়র্কের রাস্তাতেও ডাস্টবিনে খাবার খোঁজে মানুষ'। পুঁজিবাদী পথ ধরে গ্রিসের অর্থনীতিও দেউলিয়া হয়ে গেছে। তার ফলে বেতন হ্রাস ঘটছে, পেনশন ছাঁটাই হচ্ছে, চাকরি যাচ্ছে। ব্রিটেনও অগ্নিগর্ভ। সেখানেও বেতন, ডিএ, চিকিৎসা ভাতা সহ শ্রমিকদের অন্যান্য অধিকার ছাঁটাই করা হচ্ছে, ছাঁটাই হচ্ছে শিক্ষায় বরাদ্দ। সংকট এত তীব্র যে, ১০ নভেম্বর লন্ডনের রাস্তায় ৫০ হাজার ছাত্র মিছিল করেছে। ফ্রান্সে এক মাসে ৫টি ধর্মঘটের ঘটনা ঘটেছে। স্পেনেও সংকট। অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা সামলাতে স্পেনের সরকার বেতন না বাড়াবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে মাদ্রিদ শহরে হাজার হাজার শ্রমিক বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। ইওরোপের প্রত্যেকটি দেশেই বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে। পুঁজিবাদ যদি সংকটের সমাধান করতে পারত তাহলে ইউরোপের মানুষ আজ রাজপথে কেন? ৪০০ বছরেও পুঁজিবাদ জনজীবনের সংকটের সমাধান করতে পারেনি। পুঁজিবাদী পথে বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা যায় না শুধু নয়, পুঁজিবাদই এই সংকটের জন্ম দেয় এবং সংকটকে বাড়ায়।

এই পুঁজিবাদী সংকটের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ২৪-২৫ নভেম্বর ২০১০ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিশেষ পার্টি কংগ্রেসের সমাপ্তি ভাষণে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ''বস্তুত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এখন গভীর থেকে গভীরতর, ব্যাপকতর ও স্থায়ী সংকটের কবলে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা যেসব ব্যবস্থাই নিক না কেন, সেগুলো তাদের অধিকতর সংকটেই ফেলছে। পুঁজিবাদ যখন থেকে মুমূর্ষু দশায় তথা সাম্রাজ্যবাদী অবস্থায় পৌঁছেছে, সংকট থেকে বাঁচতে তখন থেকেই উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ, অসংখ্য আঞ্চলিক ও স্থানীয় যুদ্ধ, অর্থনীতিতে সামরিকীকরণ, ব্যবসা বাণিজ্যে সংরক্ষণ, তথাকথিত মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং, ডাম্পিং, মুদ্রার বিনিময় মূল্য নিয়ে কারসাজি ইত্যাদি একের পর এক নিয়েছে, কিন্তু কোনওটাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব এবং সংকট দূর করতে পারেনি।''

এহেন পুঁজিবাদই আরব দুনিয়ার দেশগুলিতে স্বৈরতন্ত্রের বজ্রমুষ্টিতে আরও কঠোরভাবে কায়েম রয়েছে। চলমান আন্দোলন স্বৈরতন্ত্রের কব্জা কিছুটা শিথিল করলেও এবং বহুদলীয় পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা কায়েম হলেও মূল অর্থনীতি যেহেতু পুঁজিবাদী, ফলে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংকট থেকে, শোষণ বঞ্চনা থেকে সামরিকতন্ত্রের গ্রাস থেকে মানুষকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিতে পারে না। সেই কারণেই আরব ভূখণ্ডের চলমান আন্দোলনকে যদি দাবি আদায় করতে হয়, যদি সম্পূর্ণ সফলতায় পৌঁছতে হয়, তাহলে এই আন্দোলনকে অবশ্যই পুঁজিবাদ উচ্ছেদের দিকে চালিত হতে হবে।

কিন্তু এই প্রশ্নে নানা অংশের মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রচুর বিভ্রান্তি। একদল মানুষ আছেন যারা বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি চান, কিন্তু বেকারত্বের আঁতুড়ঘর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কামান দাগতে চান না। বলা বাহুল্য তাঁদের এই চাওয়ার দ্বারা বেকার সমস্যা দূর হতে পারে না। একদল চিন্তাশীল মানুষ বলছেন, এই যে বিশেষ নেতৃত্বহীন আন্দোলন চলছে এটাই আন্দোলনের 'নয়া মডেল'। তাঁরা এই মডেলেই আন্দোলনের অগ্রগতি দেখতে চান। এত বড় একটা আন্দোলন বিশেষ কোনও স্বার্থান্বেষী মহল হাইজ্যাক করে যাতে বিপথে পরিচালনা করতে না পারে সেই উদ্বেগ এবং লক্ষ্য থেকে এ কথা বলার একটা মানে আছে, কিন্তু এর উদ্দেশ্য যদি হয় অরাজনীতির ধুয়ো তুলে 'দলহীন' 'নেতৃত্বহীন' আন্দোলন বা বিক্ষোভকেই মডেল বলে প্রচার করা, তবে সেটা অলীক শুধু নয়, বিপজ্জনকও বটে। দল ছাড়া রাজনীতি হয়না আর রাজনীতি বাদ দিয়ে জনস্বার্থের কথা বললে সেটা বাজে কথা হয়। যা শেষপর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থেই যাবে। সমস্ত সংকটের আঁতুড় ঘর এই পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রাম একটা বিশেষ ধরনের সংগ্রাম যা বিশেষ আদর্শে বলীয়ান পার্টি ছাড়া পরিচালনা করতে পারে না। কী সেই বিশেষ আদর্শ? সেই আদর্শ হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সেই পার্টি হল এই আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টি। ফলে আন্দোলনে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া এই আন্দোলনের মৌলিক দাবিগুলি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আরবের আন্দোলন যদি এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে তা শুধু আরব ভূখণ্ডেই নয়, গোটা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সামনে একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হবে।

এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন নানা দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ দেশের একদল মানুষ মনে করেন, ধর্মীয় মৌলবাদ-গোঁড়ামি এবং মোল্লাতন্ত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মুসলিম জনতার পক্ষে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নিয়ে মাথা তোলা সম্ভব নয়। এই চিন্তা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক বদবুদ্ধি প্রসূত। গোটা বিশ্বের মানুষ সম্ভ্রমে দেখছেন, গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নিয়ে কী বীরত্বপূর্ণ লড়াই না আরবের জনগণ করছেন। এই সংগ্রামে বোরখা পরা মহিলাদের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়।

আবার এই আন্দোলন দেখিয়ে দিচ্ছে সুদীর্ঘ ইসলামিক শাসন মুসলিম জনগণের জীবনের অভাব দূর করতে পারেনি। কোনও ধর্মীয় শাসনই যে পুঁজিবাদী শোষণজাত সমস্যা দূর করতে পারে না এই আন্দোলন থেকে তাও স্পষ্ট।

এই আন্দোলনে যুবশক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আন্দোলনের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই যুবশক্তির ভূমিকা অনন্য সাধারণ। এই আন্দোলন কতদূর এগোবে, অদূর ভবিষ্যতে কোথায় থামবে, কতটুকু দাবি আদায় করতে সক্ষম হবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে। কিন্তু এই আন্দোলন সত্যিকারের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে যদি স্বল্প দাবি আদায়ে অর্ধপথে সমাপ্ত হয়ও, তবুও এই আন্দোলন যে চেতনার জন্ম দিয়ে গেল তা পরিপূরণের জন্য বারবার আরব মরুভূমি আন্দোলনে প্লাবিত হবে। উৎপাদনে শ্রমশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপযোগী সমাজ গঠনের দাবিতে, কাজের দাবিতে, জীবনের নানা দাবিতে মানুষ বারবার সোচ্চার হবে।

এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৭৪ সালে পার্টি কর্মীদের এক সভায় বলেছিলেন, ''সমাজে শ্রমিক চাষি শোষিত মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিপ্লব বারবার গমকে গমকে আসতে চাইবে, গমকে গমকে ফেটে পড়তে চাইবে। সমাজ অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব ফুলে ফুলে উঠে বার বার বলতে চাইবে — এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই; মানুষের মগজের কাছে, মানুষের কাছে আবেদন করতে চাইবে — বিপ্লব আমি চাই। কিন্তু বিপ্লব ততদিন হবে না, বারবার সে ফিরে যাবে, বিপথগামী হয়ে ফিরে যাবে, বারবার তার দ্বারা প্রতিক্রিয়া লাভবান হবে, বিপ্লব হবে না, যতদিন না বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী পার্টির আবির্ভাব হবে।''

ফলে, এই আন্দোলনের যুক্তিসঙ্গত গতিপথ ও পরিণতি হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ছাড়া কোন ব্যবস্থা এই সংকটের সমাধান করতে সক্ষম ইতিহাস আজও তার উত্তর দিতে পারেনি। দেওয়া সম্ভব না। কারণ পুঁজিবাদের সংকট সমাজতন্ত্র ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। এই সমাজতন্ত্রের নির্মাণে রাশিয়ায়, চীনে, পূর্ব ইউরোপে কতটুকু কী ভুল হয়েছিল তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এগিয়ে যাবে। ইতিহাসে প্রগতির শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শক্তির নিয়ত লড়াইয়ে জয়, পরাজয়, আবার জয় — এসব আছে। সমাজপ্রগতির নিয়মেই বুর্জোয়াদের শক্তিকে পরাজিত করে সমাজতন্ত্র এসেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদীদের ষড়যন্ত্রে সেই সমাজতন্ত্রের সাময়িক পরাজয় ঘটেছে। ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই আবার সমাজতন্ত্রের চেতনাকে জাগাবে। কিন্তু সেটা আপনা-আপনি হবে না, এখানেই সঠিক নেতৃত্বের আবশ্যিকতা।

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩*

২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*

৩। *মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী*
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৪। *প্রকাশকের নাম ঃ*
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৫। *সম্পাদকের নাম ঃ*
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

৬। *স্বত্বাধিকারী ঃ*
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩

আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী

১-৩-২০১১ *প্রকাশকের স্বাক্ষর*

প্রবীণ পার্টি দরদীর জীবনাবসান

পার্টির দৃঢ় সমর্থক দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা গীতা চক্রবর্তী গত ৩০ ডিসেম্বর ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা, যে কাউকে নিজের করে নিতে পারতেন। তাঁর বাড়িতে যে কয়েকটি গরিব মেয়ে বাড়ির কাজের জন্য থেকেছে, তিনি তাদের প্রত্যেককে নিজের হাতে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কয়েক মাস আগে পর্যন্ত 'শান্তিদান' নামে একটা মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠানে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। তিনি দলের মুখপত্র গণদাবী সহ সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য সম্বলিত পুস্তিকা অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়তেন এবং নানা প্রশ্ন নিয়ে তাঁর পরিচিত দলের কর্মীদের সাথে আলোচনা করতেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থাতেও তিনি পরিচিত পার্টি কর্মীদের বাড়িতে ডেকে পার্টির কাজকর্মের খোঁজ নিয়েছেন। সম্প্রতি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁর ঘনিষ্ঠ এক পার্টি কর্মীকে ডেকে বলেছিলেন 'আমি কোনওদিন রাস্তায় নেমে দলের কাজ করতে পারিনি, কোথাও দলের সামান্য অগ্রগতির কথা শুনলে মন ভরে ওঠে, তার পর বলেছিলেন 'মেহগনি' গাছ যেমন রক্ষা করা কঠিন, কিন্তু রক্ষা করতে পারলে, তার কাঠটা হয় অত্যন্ত মজবুত ও দামী, এস ইউ সি দলকে আমার তেমনই মনে হয়,এই দল একদিন তার লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছবে, এ আমার অন্তরের বিশ্বাস। দলের এমন একজন সুহৃদকে হারিয়ে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি।

নির্মাণকর্মীদের পরিচয়পত্র ও পাশ বই বিতরণ

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা নির্মাণকর্মী ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি পরিচয়পত্র ও পাশবইয়ের দাবি জানিয়ে আসছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দঃ ২৪পরগণার রায়দিঘি বিধানসভা এলাকায় ক্যাম্প করে ৭০০ নির্মাণকর্মীর মধ্যে ঐ পরিচয়পত্র ও পাশবই বিতরণ করা হয়। কৃষ্ণচন্দ্রপুরে ৬ ফেব্রুয়ারি জেলাপরিষদ সদস্য পূর্ণচন্দ্র নাইয়া, কঙ্কনদিঘিতে ৯ ফেব্রুয়ারি মথুরাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ উদয় মন্ডল এবং রাধাকান্তপুরে ২৪ ফেব্রুয়ারি ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ গুণসিন্ধু হালদারের উপস্থিতিতে পরিচয়পত্র ও পাশবই বিতরণ করা হয়। ইউনিয়নের দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি সনাতন দাস ক্যাম্পগুলি পরিচালনা করেন।

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

(২০১০ সালের ৫ মার্চ স্ট্যালিন স্মরণ দিবস উপলক্ষে নর্থস্টার কম্পাস পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমেরিকার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ দু'বোয়া-র নিচের নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালে মহান নেতার জীবনাবসানের পরপরই লিখিত এই প্রতিবেদনটি আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

জোসেফ স্ট্যালিন ছিলেন মহান। বিংশ শতাব্দীর হাতে গোনা কয়েকজন মানুষই তাঁর উচ্চতার কাছাকাছি যেতে পারেন। তিনি ছিলেন বাহুল্যহীন, শান্ত আর সাহসী। কদাচিৎ তিনি স্থৈর্য হারাতেন; সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবতেন ধীরভাবে, যথেষ্ট সময় দিয়ে। সিদ্ধান্ত নিতেন স্পষ্টভাবে আর দৃঢ়তার সাথে। তিনি কখনই আড়ম্বর পছন্দ করতেন না। মর্যাদার সাথে নিজের যথাযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকতেও তিনি লজ্জা পেতেন না। তিনি ভূমিদাসের সন্তান, কিন্তু বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সামনে শান্ত চিত্তে, অবিচল ভাবে দাঁড়িয়েছেন। আবার তাঁর মহত্ত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল যে, তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনকে নিবিড়ভাবে জানতেন, তাদের সমস্যা বুঝতেন ও তার শরিক হতে পেরেছিলেন।

প্রথাগত শিক্ষার মানুষ তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি। তিনি চিন্তা করতেন গভীরভাবে, পড়াশুনা করতেন উপলব্ধির ভিত্তিতে। যথার্থ জ্ঞানের কথা, সেটা যেই বলুন, তিনি শুনতেন। তাঁর মতো এত আক্রান্ত আর কোনও ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্বকেই হতে হয়নি, এত কুৎসাও আর কারও উপর বর্ষিত হয়নি। তবুও তিনি কখনও সৌজন্য হারাননি, বিচলিত হননি। তাঁর ভারসাম্য কখনও নষ্ট হয়নি। শত আক্রমণও তাঁকে তাঁর প্রত্যয় থেকে টলাতে পারেনি। যা সঠিক বলে বুঝেছেন তা থেকে তিনি সরে আসেননি। তিনিই প্রথম রাশিয়াকে জাতিবিদ্বেষ জয় করার লক্ষ্যে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস না করেই ১৪০টি গোষ্ঠীকে নিয়ে এক জাতি হয়ে ওঠার পথে যাত্রা শুরু করান।

স্ট্যালিন মানুষ চিনতেন গভীরভাবে। যে ট্রটস্কি তার বাগাড়ম্বর আর জাহিরিপনা দিয়ে গোটা দুনিয়াকে, বিশেষ করে আমেরিকাকে বোকা বানাতে পেরেছিলেন, স্ট্যালিন তা ধরে ফেলেন একেবারে শুরুতেই। আজও যে আমেরিকার উদারনীতিবাদীদের মধ্যে স্ট্যালিন সম্পর্কে অশ্রদ্ধার মনোভাব দেখা যায়, তা শুরু হয়েছিল ট্রটস্কির মিথ্যা প্রচারকে আমরা বোকার মতো সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেছিলাম বলে। সারা বিশ্ব জুড়েই ট্রটস্কি এই মিথ্যা প্রচার চালান। এর বিরুদ্ধে স্ট্যালিন দাঁড়িয়েছিলেন অটল পর্বতের মতো দৃঢ়তা নিয়ে। তিনি না দক্ষিণ, না বাম, কোনও দিকেই ঝোঁকেননি। ট্রটস্কির মেকি সমাজতন্ত্রের বিপরীতে স্ট্যালিন প্রকৃত সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন।

স্ট্যালিনকে তাঁর সময়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং তিনি তার মোকাবিলাও করেছিলেন অসম সাহসিকতায়। প্রথমত, চাষিদের সমস্যা, তারপর পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির আক্রমণ এবং তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। গরিব রুশ চাষিরা জারতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও রক্ষণশীল চার্চের দ্বারা চরম নিষ্পেষিত ছিল। কিন্তু রুশ কুলাকরা (বৃহৎ জোতদার) পুঁজিবাদকে প্রাণপণে আঁকড়ে ছিল। এবং স্ট্যালিন যখন দ্বিতীয় বিপ্লবের ঝুঁকি নিলেন, তখন এই কুলাকরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল। কিন্তু স্ট্যালিন রাশিয়ার চাষিদের রক্ত মোক্ষণকারী এই কুলাকদের হটিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর এল বিদেশি হস্তক্ষেপ। পশ্চিমী দেশগুলোর দ্বারা আক্রমণের নিরন্তর হুমকি। মাঝে পুঁজিবাদী মহামন্দায় তা কিছুটা স্তিমিত হলেও পশ্চিমী সমর্থনে মাথা তোলা হিটলারবাদের দ্বারা আবার তা শুরু হয়। স্ট্যালিনই হচ্ছেন সেই নেতা, যিনি উভয় সঙ্কটের মধ্য থেকে —একদিকে পশ্চিম ইউরোপ, অন্যদিকে আমেরিকার ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা উভয়েই সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ফ্যাসিবাদের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চেয়েছিল। আবার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এদেরকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে ভিক্ষার ঝুলি পাততে হয়েছিল। স্ট্যালিনের থেকে খাটো কোনও মানুষ রাষ্ট্রনায়ক হলে মিউনিখ চুক্তির জন্য প্রতিশোধ নিতে ছাড়তেন না। স্ট্যালিন কিন্তু শুধুমাত্র তাঁর পিতৃভূমির জন্য ন্যায়বিচার চেয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট রাজি হলেও ব্রিটেনের চার্চিল হলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চাইল দক্ষিণ ইউরোপ ও আফ্রিকায় নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করতে, ততদিন হিটলার সোভিয়েত ধ্বংস করে তো করুক।

পশ্চিমের দেশগুলো ইচ্ছে করেই দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে দেরি করছিল। স্ট্যালিন কিন্তু দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হিটলার ও মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদকে ধ্বংসের জন্য স্ট্যালিন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো ঝুঁকিও নিয়েছিলেন। স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান নাৎসীদের পরাজয়ের পর পশ্চিম দুনিয়া হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিল না। সোভিয়েটকে এই জয়ের জন্য ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয়েছিল। বাইরের দুনিয়া আজও কোনও ধারণা করতে পারবে না কত ক্ষয়ক্ষতি, কত আত্মবলিদান, কত করুণ কাহিনী এখানে তৈরি হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে ও গোটা বিশ্ব জুড়ে স্ট্যালিনের ধীর, দৃঢ়, বজ্রকঠোর নেতৃত্বের জন্যই স্ট্যালিন জনগণের দ্বারা পূজিত হয়েছেন।

তারপর এল শান্তিরক্ষার সমস্যা। ইউরোপের পক্ষে তা যতটা কঠিন কাজ ছিল, স্ট্যালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে তা ছিল আরও অনেক কঠিন। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকরা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও স্ট্যালিনকে ঘৃণা ও ভয়ের চোখে দেখত। এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টার পরাজয় ও ব্যর্থতা দেখতে তারা উদগ্রীব ছিল। কিন্তু তারা আবার পূর্ব এশিয়ায় যেখানে তাদের উপনিবেশ ছিল, সেখানে জাপানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ভয় পেত। কূটনৈতিক চালে তারা স্ট্যালিনকে ফাঁদে ফেলতে চাইল — চার্চিল ও রুজভেল্ট স্ট্যালিনকে কনফারেন্সে ডাকলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে প্রশিক্ষিত ও হৃষ্টপুষ্ট ঝানু কূটনীতিকরা এবং তার সাথে ছিলেন বিরাট ঐশ্বর্য ও শক্তির প্রতিভূ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট।

এখানেই স্ট্যালিন তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব দেখালেন। হীনমন্যতা বা অহমিকা কোনওটাই তাঁর ছিল না এবং কোথাও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। রুজভেল্টের বন্ধুত্ব আর চার্চিলের শ্রদ্ধা তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন। তিনি তোষামোদও চাননি, প্রতিহিংসামূলক মনোভাবও চাননি। তিনি যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে নমনীয় ভাব নিয়েছিলেন। কিন্তু যেটা তাঁর কাছে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে, সেখানে তিনি ছিলেন অনমনীয়। লিগ অব নেশনস সোভিয়েটকে অপমান করলেও তিনি তার পুনর্জাগরণ চেয়েছিলেন। জাপানের দিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও ভয় ছিল না। সেই ভয়টা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও মার্কিন অর্থনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের। তবুও স্ট্যালিন জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লালফৌজের শক্তি দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দু'টি বিষয়ে স্ট্যালিন ছিলেন অনড়। সোভিয়েট ইউনিয়নের যে ভূখণ্ড সোভিয়েটকে ভয় দেখানোর জন্য চুরি করা হয়েছিল, সেটা ফেরত দিতে হবে। জমির একচেটিয়া কারবারীদের স্বার্থে বলকানদের পশ্চিমী শোষণের অসহায় শিকার করা চলবে না। সেখানকার শ্রমিক-কৃষকরাই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

এই ছিলেন স্ট্যালিন যিনি আজ আর নেই। কিন্তু তবুও পশ্চিমে কিছু দেশের মধ্য থেকে অসভ্য মানুষের স্ট্যালিনবিরোধী হুক্কা হুয়া রব শোনা যাচ্ছে। সারা জীবন ধরে স্ট্যালিনের উপর নিরন্তর ও উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা বর্ষিত হয়েছে। নিজ দায়িত্বেই তিনি অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

মহান শিক্ষক জে ভি স্ট্যালিনের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যেই রয়েছে এই মানুষটির পুরস্কার।

বুর্জোয়ারা জাতীয় স্বাধীনতার পতাকা ফেলে দিয়েছে

জে ভি স্ট্যালিন

(কমরেড স্ট্যালিন অসুস্থ থাকায় ১৯৫২ সালে অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ কংগ্রেসে স্ট্যালিনেরই গাইডেন্সে লিখিত মূল রিপোর্টটি পেশ করেন কমরেড ম্যালেনকভ। ১৪ অক্টোবরে শেষ অধিবেশনে কমরেড স্ট্যালিন সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। সেই শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে মহান নেতার স্মরণ দিবস উপলক্ষে তাঁর সেই মূল্যবান ভাষণটির বঙ্গানুবাদ আমরা প্রকাশ করছি — সম্পাদক ,গণদাবী)।

কমরেডস, ভ্রাতৃপ্রতিম যেসব পার্টি ও গ্রুপের প্রতিনিধিরা তাঁদের উপস্থিতির দ্বারা আমাদের কংগ্রেসকে সফল হতে সাহায্য করেছেন বা যাঁরা বার্তা পাঠিয়ে কংগ্রেসকে অভিনন্দন ও আমাদের প্রতি শুভকামনা জানিয়েছেন, তাঁদের সৌভ্রাত্রের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। (দীর্ঘ ও সোচ্চার অভিনন্দনে হল ভরে যায়)।

তাঁদের আস্থা আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ তা দেখায় যে, জনগণের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার জন্য আমাদের সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের সংগ্রামে পার্টিকে সমর্থন করতে তাঁরা প্রস্তুত। (দীর্ঘ ও সোচ্চার করতালি)।

আমাদের দল অপরাজেয় শক্তির অধিকারী অতএব আমাদের আর কারও সমর্থন প্রয়োজন নেই একথা ভাবা ভুল, কারণ তা সত্য নয়। বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সমর্থন, সহানুভূতি ও আস্থা আমাদের দলের ও দেশের কাছে সর্বদা প্রয়োজন।

আমাদের প্রতি তাঁদের সমর্থনের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, যখনই তাঁরা আমাদের দলের শান্তি আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন জানান, তখন একই সঙ্গে তাঁরা শান্তি বজায় রাখার জন্য নিজ দেশের জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করেন।

১৯১৮-১৯ সালে যখন ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা সোভিয়েটভূমির উপর সশস্ত্র আক্রমণ হেনেছিল, তখন 'রাশিয়া থেকে হাত ওঠাও' রণধ্বনি দিয়ে ব্রিটিশ শ্রমজীবী মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রকৃত সমর্থন একেই বলে। একদিকে শান্তির জন্য নিজ দেশের জনগণের লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন, অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন। কমরেড থোরেজ বা কমরেড তোগলিয়াত্তি ঘোষণা করেছেন, তাঁদের দেশের জনগণ সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে যাবে না। এই হল খাঁটি সমর্থন। কারণ ইতালি ও ফ্রান্সের শ্রমিক-কৃষক, যাঁরা শান্তির জন্য লড়ছেন তাঁরা সর্বোপরি সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তি-আকাঙ্ক্ষার পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এই পারস্পরিক সমর্থনের মূলে যেটা আছে তা হল, শান্তিকামী জনগণের স্বার্থের সঙ্গে আমাদের দলের স্বার্থের কোনও বিরুদ্ধতা না থাকা বরং পরিপূরক হিসাবে তার মিলে যাওয়া। (সোচ্চার অভিনন্দন)। বিশ্বশান্তির প্রয়োজনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের চাওয়া-পাওয়া এক ও অভিন্ন।

স্বাভাবিকভাবেই ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির কাছ থেকে আমাদের পার্টি শুধু সমর্থন নেবে, দেবে না কিছুই, তা হতে পারে না। বিনিময়ে মুক্তির জন্য তাঁদের লড়াই, শান্তি বজায় রাখার জন্য তাঁদের সংগ্রামের প্রতি আমরা সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেব। আর এটাই আমরা করছি (সোচ্চার অভিনন্দন)। ১৯১৭ সালে ক্ষমতা দখল এবং পুঁজিবাদী ও সামন্তী দমনপীড়নের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমাদের দলের কর্মকাণ্ডের সাহসিকতা ও সাফল্য দেখে ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলি বলে, আমরা হলাম বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের 'শক ব্রিগেড'। এই নামকরণের পিছনে রয়েছে, আমাদের প্রতি তাঁদের আশার অভিব্যক্তি। তাঁদের আশা, 'শক ব্রিগেডে'র সাফল্য, পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনগণের যন্ত্রণার উপশম ঘটাবে। আমার মনে হয়, জার্মান ও জাপানি ফ্যাসিবাদের দাসত্বের কবল থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার জনগণকে মুক্ত করার দ্বারা আমাদের দল তাঁদের আশার প্রতি সুবিচার করেছে।

যতদিন 'শক ব্রিগেড' হিসাবে আমরা একক ছিলাম, যতদিন অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে একা আমরা কাজ করেছি, ততদিন মর্যাদাময় ও মহান এই দায়িত্ব পালন ছিল অত্যন্ত কঠিন। আজ পরিস্থিতি বদলেছে। আজ চিন থেকে কোরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে হাঙ্গেরি, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নতুন 'শক ব্রিগেড' রূপে গড়ে উঠেছে। আজ আমাদের লড়াই অনেক সহজ হয়েছে, কাজ এগোচ্ছে সাবলীলভাবে।

আজও যেসব কমিউনিস্ট,গণতান্ত্রিক, শ্রমিক-কৃষকের পার্টি ক্ষমতা দখল করতে পারেনি, দানবীয় বুর্জোয়া আইনের বুটের তলায় যাদের কাজ করতে হচ্ছে, তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। তাদের কাজটা আরও কঠিন।

তবে আমাদের, রুশ কমিউনিস্টদের অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল, কারণ জারতন্ত্রের অধীনে প্রগতির পথে এক পা এগোনোই ছিল বিরাট অপরাধ। কিন্তু প্রতিবন্ধকতাকে ভয় না পেয়ে রুশ কমিউনিস্টরা মাটি কামড়ে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে এনেছে। এই দলগুলিকেও তা-ই করতে হবে।

জারতন্ত্রের অধীনে রুশ কমিউনিস্টদের যে অসম্ভব কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল, এইসব দলগুলিকে তা করতে হবে না কেন?

কারণ, প্রথমত, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংগ্রাম ও বিজয়ের দৃষ্টান্ত তাদের চোখের সামনে রয়েছে। কাজেই অপরের ভুলগুলি থেকে নিজেদের শুধরে নেওয়া ও অপরের সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ এই দলগুলির রয়েছে, যা তাদের কাজের গুরুভার অনেকটা লাঘব করেছে।

দ্বিতীয়ত, গণমুক্তির প্রধান শত্রু বুর্জোয়ারা বদলে গিয়েছে। তারা অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে, ফলে জনগণকে তারা হারিয়েছে এবং তার দ্বারা নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির কাজ সহজতর হয়েছে।

আজ কেবল বচনে বুর্জোয়ারা উদার সাজতে

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

গণআন্দোলন দমনই কংগ্রেসের ঐতিহ্য

ভোটের বাদ্যি বাজতে না বাজতেই কংগ্রেস জনগণের 'পাশে থাকার' কথা বলতে শুরু করেছে। যদিও এই কংগ্রেসকে জনগণের তথা গণআন্দোলনের পাশে থাকতে মানুষ কখনওই দেখেনি। নন্দীগ্রামে জমি রক্ষার আন্দোলনে কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে সিপিএম ক্রিমিনালরা পুড়িয়ে মারলেও কংগ্রেসের বিবেক জাগেনি। আর এখন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসাধারণের পাশে থাকার কথা বলে ভোটে ভাগ বসাতে চাইছে। কোনও দিনই কংগ্রেস গণআন্দোলনের শক্তি নয়, বরং আন্দোলন ভাঙার ও দমনের শক্তি। এই কংগ্রেসই জঙ্গলমহলে সিপিএমের সাথে হাত মিলিয়ে যৌথ বাহিনী নামিয়েছে। যে বাহিনীর মদতেই সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনী গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে খুন, ধর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিচারে।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে এই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার জায়তাপুরে ভারতের সর্ববৃহৎ পরমাণু কেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে ফরাসি কোম্পানি অ্যারেভা এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (এন পি সি আই) একটি চুক্তি করে। এই চুক্তির প্রতিবাদ করেন স্থানীয় চাষি-সাধারণ মানুষ সহ বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু সরকার কোনও বিরোধিতাকেই আমল দিতে চায়নি। বরং আন্দোলন দমন করতে পুলিশ পাঠিয়েছে কংগ্রেস সরকার। বাস্তবিক এ রাজ্যে সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে শাসক হিসাবে সিপিএম যে ভূমিকা পালন করেছে, জায়তাপুরে কংগ্রেসও সেই একই ভূমিকা পালন করেছে।

কেন জায়তাপুরের মানুষ এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন? মহারাষ্ট্রের পশ্চিম অংশে রত্নগিরি জেলার জায়তাপুর-মাদবন ২০১০ সালে আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল কেন? প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা কঙ্কন অঞ্চলের অধিবাসীরা কেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল? ফরাসি কোম্পানি অ্যারেভাকে ১৬৫০ মেগাওয়াটের ৬টি রিয়াক্টর ও নিউক্লিয়ার পার্ক তৈরি করার ছাড়পত্র দেয় মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার। এর জন্য মাদবন, কারেল, মিথগাভেন এবং নিভেলি গ্রামের ৯৩৮.০২৬ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা করে সরকার। জমি হারান ২ হাজার ৩৩৫ জন কৃষক। এর জন্য জমি হারানো পরিবারের একজনের চাকরি অথবা পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। অল্প কিছু জমির মালিক ছাড়া অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব। কারণ, পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র হলে তাতে শুধু জীবন-জীবিকাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনজীবন এবং পরিবেশ। এখানে মৎস্যজীবীদের একটা বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভয়ানকভাবে। পরমাণু কেন্দ্রের ছাই ও তেজস্ক্রিয় তরল বর্জ্য পদার্থ মানুষ ও জীবজগতের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকারক। এতে ২০০ হেক্টরের বেশি ম্যানগ্রোভ এবং মাছ, পাখি,শামুক ও কচ্ছপের নার্সারি ধ্বংস হবে। যে ক্ষতি মেটানো যাবে না কোনও ক্ষতিপূরণ দিয়েই। পরিবেশবিদরাও সরকারকে সতর্ক করে এ বিষয়ে।

জায়তাপুর আরও উত্তপ্ত হয় গত ডিসেম্বর মাসে যখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলাই সারকোজি এ দেশে আসেন। নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড শর্তাধীনে পরিবেশ ছাড়পত্র পায় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার। পরিবেশবিদদের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে সরকার সবুজ সিগন্যাল দেওয়ায় জমির মালিক ও স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ সভা হয়। এর জবাব কংগ্রেস সরকার দেয় পুলিশি অত্যাচার দিয়ে। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার এবং অন্যান্য মিথ্যা কেস দেওয়া হয়।

সরকারের দাবি, তারা পরমাণু কেন্দ্র গড়ে বিদ্যুৎহীন গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেবে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী এর পক্ষে এমনও যুক্তি করেছেন যে, কয়লা থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। মনে হতে পারে সাধারণ মানুষের হিতসাধনেই সরকার এমন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। কিন্তু তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে কয়েকদিনের মধ্যেই।

কঙ্কন বাঁচাও সমিতি, কঙ্কন বিনাশকারী প্রকল্প বিরোধী সমিতি, জনহিত সেবা সমিতির বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের প্রকল্প এলাকায় শুধু নয়, জেলায় প্রবেশেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কংগ্রেস সরকার কতখানি অগণতান্ত্রিক, এই ঘটনাতেই তা স্পষ্ট। মুম্বই হাইকোর্টের ৭০ বছরের প্রবীণ এক প্রাক্তন বিচারপতিকে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা না মানায় গ্রেপ্তার করা হয়। আন্দোলনকারীদের পক্ষে দাঁড়ান বিশিষ্ট জনরাও। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি পি বি সাওয়ান্ত এবং নৌবাহিনীর প্রাক্তন মুখ্য অধিকর্তা অ্যাডমিরাল এল রামদাসের ওপরও জেলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। কারণ, তারা আন্দোলনকারীদের পক্ষ নিয়েছিলেন। আন্দোলনকারী ও নেতৃবর্গের নামে কুৎসা রটনা হবে এবং তাঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হবে জেনেই তাঁরা দীর্ঘ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে পড়ে সরকার ও পুলিশবাহিনী আন্দোলন ধ্বংসের চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও নতুন নতুন অংশের মানুষ আন্দোলনে যোগ দেন। সিন্ধুদুর্গের ৪৬ জন আইনজীবী ওকালতনামায় সই করে আন্দোলনে সমর্থন জানান। যে সমস্ত ডাক্তারের জমি পরমাণু কেন্দ্রের জন্য অধিগৃহীত হয়েছে তারাও আন্দোলনে অংশ নেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহানের ডাকা বৈঠকও বয়কট করে সমিতিগুলি। মৎস্যজীবীরা দাবি তোলেন 'আমাদের বাঁচতে দাও'। পরিবেশবিদরাও মুখর হন প্রতিবাদে।

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র না হয়ে কোনও শ্রমনিবিড় শিল্প যদি ওখানে হত, তাহলে কি মানুষগুলি প্রতিবাদে সোচ্চার হত? যে জমির মালিকের জমি গেছে সে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পেলে বড়জোর আন্দোলনে নামত। কিন্তু এখানে বিক্ষোভ হচ্ছে আরও গুরুতর বিষয়কে কেন্দ্র করে। মানবদেহ তথা জীবদেহের উপর পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যে মাত্রাছাড়া ক্ষতি করবে এ কথা জেনেই তারা মরণপণ সংগ্রামে নেমেছেন। বিপুল ক্ষতি আটকাতেই মানুষগুলি মরণ-বাঁচন সংগ্রামে নেমেছেন। বিশ্বের বহু দেশে যে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করা হচ্ছে, তাকে নতুন করে এ দেশে আমদানি করে কার স্বার্থ দেখছে মহারাষ্ট্র সরকার? তারা কি অভুক্ত কৃষক, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কথা ভেবে এর ছাড়পত্র দিয়েছে? তাহলে তো কর্মসংস্থানমুখী অন্যান্য বহু কারখানা গড়ে তুলতে পারত। তা না করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনের জন্য ফরাসি কোম্পানিকে দিল কেন যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে কর্মসংস্থানও হবে নগণ্য? কারণ, এতে কারখানা মালিকের লাভ হবে বিপুল। বখরা মিলবে সরকারেরও। কারণ, পুঁজি মালিকের অর্থেই ভোট কেনাবেচা করে সরকারগুলি। তাই সরকার কৃষককে জমিহারা করে, বহু মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে রে রে করে নেমে পড়েছে জমি অধিগ্রহণে। তাদের দরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের তোষণ করা। যা তারা গত ৬৩ বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টায় দ্ব্যর্থহীনভাবে করে চলেছে। কংগ্রেসের দোসর সিপিএমও পুঁজিপতিদের স্বার্থে এ রাজ্যের হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর সাথে জনস্বার্থের বিন্দুমাত্র যোগ নেই।

নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, লালগড়, জায়তাপুরের ঘটনার পর এই উভয় দলের কি আর মানুষের কাছে ভোটপ্রার্থী হওয়ার অধিকার আছে? তাদের শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত জনগণ ইতিমধ্যেই এর জবাব দিয়েছে রাজ্যে রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গবাসীও কংগ্রেসকে সাইনবোর্ড সর্বস্ব দলে পরিণত করেছে। আগামী নির্বাচনেও আন্দোলন দমনকারী কংগ্রেসকে তারা ছুঁড়ে ফেলবে আস্তাকুঁড়ে।

পতাকা ফেলে দিয়েছে

সাতের পাতার পর

পারে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা তুলে ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু আসলে উদারতার লেশমাত্র তাদের নেই। তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতা শুধু তাদেরই আছে যারা পুঁজির মালিক। বাকি সব নাগরিকই হল মানবদেহী কাঁচামাল, নিছক শোষণের পাত্র। ব্যক্তি ও জাতির সমানাধিকার আজ বুটের তলায়। পরিবর্তে মুষ্টিমেয় শোষকের জন্য সর্বপ্রকার অধিকার আর শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের কোনও অধিকারই নেই। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও মুক্তির পতাকা ধূলায় লুণ্ঠিত। আমি মনে করি, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে পাশে পেতে চান, তবে আপনাদের, কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে সেই পতাকা তুলে ধরতে হবে, বহন করতে হবে। তা তুলে ধরার জন্য আর কেউ নেই।

অতীতে বুর্জোয়ারা ছিল জাতির নেতা, তারা জাতীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে 'সকলের উপরে' স্থান দিত। এখন 'জাতীয় স্বাধীনতার নীতির' লেশমাত্র নিয়ে তারা চলে না। বুর্জোয়ারা এখন জাতীয় স্বাধীনতা ও অধিকার ডলারের মূল্যে বিকিয়ে দিয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের পতাকা তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। যদি আপনারা দেশপ্রেমিক হিসাবে পরিচয় দিতে চান, জাতির নেতা হতে চান তবে আপনাদের, কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদেরই তা তুলে ধরতে হবে। আর কেউ এটা করতে পারে না।

এই হল বাস্তব পরিস্থিতি।

স্বাভাবিকভাবে, যে সব কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক পার্টি আজও ক্ষমতা দখল করেনি, এই নতুন পরিস্থিতি তাদের কাজ হালকা করে দেবে।

ফলে, যেসব দেশে আজও পুঁজির দাপট চলছে, সেখানে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি নিশ্চয় বিজয়ী হবে। (বিপুল অভিনন্দন)।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি জিন্দাবাদ (সুদীর্ঘক্ষণ হর্ষধ্বনি)।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির নেতারা দীর্ঘজীবী হোন(সুদীর্ঘক্ষণ হর্ষধ্বনি)।

যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক (সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সোচ্চারে দীর্ঘক্ষণ অভিনন্দন জানান। স্লোগান ওঠে কমরেড স্ট্যালিন জিন্দাবাদ, বিশ্বশ্রমিক শ্রেণীর নেতা কমরেড স্ট্যালিন লাল সেলাম। বিশ্বশান্তি জিন্দাবাদ)।

দিল্লিতে বিশাল শ্রমিক কর্মচারী সমাবেশ

এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ৮টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ২৩ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার শ্রমিক ৫ দফা দাবিতে সংসদ অভিযান করে। বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।